জে, বি, এস, হ্যালডেন

এক যে ছিল যাদুকর

অনুবাদক
অশোক গুহ

পূরবী পাবলিশার্স
৩৭।৭, বেণিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা

প্রকাশক : গিরীন চক্রবর্ত্তী
পূরবী পাবলিশার্স
৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
জুলাই, ১৯৪৫

দাম—দেড় টাকা

প্রিণ্টার : কিশোরীমোহন নন্দী
গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা

সূচী

আমার কিশোর ভাই বোনেরা,

যাঁর লেখা গল্পগুলি তোমাদের উপহার দিচ্ছি, তিনি আজকালকার একজন সেরা বিজ্ঞানী। নাম তাঁর জে, বি, এস হ্যালডেন। তাঁর বাবা লর্ড হ্যালডেন বিজ্ঞানী হিসেবে জগত-জোড়া নাম কিনেছিলেন। ছেলেও বাবার এই নাম পুরোপুরি বজায় রেখেছেন। এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে? ছোটবেলা থেকে বৈজ্ঞানিক আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে তিনি যদি অন্য কিছু হতেন, সেইটেই হত সব চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার। তবে তা কি আর হয় না? তোমরা নিজেরাই তার ভুরি ভুরি উদাহরণ দিতে পারবে। কিন্তু জে, বি, এসের বাবার কড়া নজর ছিলো বলেই ছেলে বিজ্ঞানী হয়ে উঠলেন। ছেলের যখন মাত্র তিন বছর বয়স তখন থেকেই বাবা উঠেপড়ে লেগে গেলেন ছেলেকে তালিম দিতে। তার শরীর থেকে রক্ত বার করে নিয়ে নানা পরীক্ষা স্থরু করলেন তিনি। জে, বি, এস, বলেন যে তাঁর জীবনে এমন সব অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে, এবং ঘটছে যা নাকি রূপকথাকেও হার মানায়। তিনি একবার কি একটা আবিষ্কার করতে আকাশের এমন এক জায়গায় গিয়ে পৌছেছিলেন, যেখানে হাওয়ার চাপ অত্যন্ত বেশি। সেখান থেকে অনেক কষ্টে ফিরলেন বটে, কিন্তু ক'মাস আর হাত নাড়তে পারেন নি। কিন্তু তাই বলে

আবিষ্কারের ঝোঁক তাঁর একটুও কমে নি। এই ত এখন তিনি কি করে ডুবে-যাওয়া সাবমেরিন থেকে বেরিয়ে আসা যায়, তারই উপায় বার করবার জন্ম চেষ্টা করছেন। শীগ্‌গিরই তোমরা তাঁর এই আবিষ্কারের খবর পাবে।

জে, বি, এসের মতে আজকের যুগের যাদু-বিদ্যা হচ্ছে বিজ্ঞান। পুরণো দিনের যাদুকরেরা যাদুদণ্ড ছুঁইয়ে যে অঘটন ঘটাত, আজকের বিজ্ঞানীরা তাই করছেন ল্যাবরেটরীতে। যাদুকরদের থেকে তাঁরা কম যান না। এই গল্পগুলির ভেতরে এমনি দু-একজন বিজ্ঞানীর দেখা তোমরা পাবে। কিন্তু বেশির ভাগ গল্প যাঁকে নিয়ে লেখা সেই শ্রীযুক্ত লিকি হচ্ছেন একজন খাঁটি যাদুকর। তাঁর তাঁবে আছে এক জিন, এক বিরাট অক্টোপাস আর এক বাচ্চা ড্রাগন। কিন্তু তাদের সাহায্যে তিনি কারো ক্ষতি করতে ত চানই না, বরং উপকারই করছেন সবার। তা ছাড়া তাঁর সংসারের খুঁটিনাটি কাজগুলোও তারাই করে দিচ্ছে। আবদুল মক্কারের মত জলজ্যান্ত জিন কানাডায় ছুটছে এক ডজন ব্লেড আনতে, ক্ষুদে ড্রাগন পম্পি করছে রান্না, আর অক্টোপাস অলিভার আট হাত নিয়ে লেগে গেছে পরিবেষনে। শ্রীযুক্ত লিকির মত হচ্ছে, কাজেই যদি না এলো ত এই সব অদ্ভুত জীব পুষে লাভ কি? লিকি ঠিকই বলেছেন, না?

এবার জে, বি, এস হ্যালডেন সম্বন্ধে দু-একটা খবর দিচ্ছি। একান্ন বছর এখন তাঁর বয়েস। শরীরের ওজন প্রায় আড়াই মণ। টাক চক্‌চক্ করছে মাথায়।

সাঁতরাতে খুব ভালোবাসেন তিনি। রাজনীতির দিক থেকেও তিনি একজন কমিউনিস্ট।

তোমাদের জন্যে এই গল্পগুলি তিনি লিখেছিলেন উনিশ শ' তেত্রিশ সালের আগে। তারপর পৃথিবীতে কত ওলট-পালট হয়ে গেল। হিটলার জার্মানীর কর্তা হয়ে বসলেন। হ্যালডেনও গল্প লেখা ছেড়ে দিলেন। জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, কাদের জন্য আর লিখবেন! ছেলেদের মনে কি আর ফূর্তি আছে! হিটলার সে-সব কেড়ে নিয়েছেন। তাই তোমাদের জন্যে তিনি আর কলম ধরেন নি। ইতিমধ্যে তিনি নানা আবিষ্কার করেছেন আর 'বংশগতি' সম্বন্ধে অনেক মোটা মোটা বই লিখেছেন। তোমরা বড় হলে সে-সব বই পড়বে। 'বংশগতি' কি? এই ত মুস্কিলে ফেললে! আমি কি মস্ত পণ্ডিত যে জলের মত তোমাদের বুঝিয়ে দেব। যা হোক একবার চেষ্টা করে ত দেখি। ধর, তোমাদের কারুর একটি ভাই হয়েছে। বুড়ি ঠাকুমা মোহর দিয়ে খোকার মুখ দেখতে এসে বললেন, "জয় বাবা নাকেশ্বর! আমাদের চোদ্দপুরুষেও তো এমন নাক দেখি নি রে বাপু!" কিন্তু ঠাকুমা এইখানেই ভুল করলেন। বিজ্ঞানীরা বলেন, নাক ত আর উড়ে এসে খোকার মুখে জুড়ে বসে নি, নিশ্চয়ই কয়েক পুরুষ আগে এমনি একজন নাকেশ্বর এই বংশে জন্মেছিলেন। এবার বুঝতে পারলে ত! না পারলে তোমাদের দাদাদের জিজ্ঞেস কর। শুধু চেহারাই নয়—বাপ-ঠাকুর্দার দোষগুণগুলোও

কিন্তু মানুষ পায়। হ্যালডেন সাহেবই ত তার এক মস্ত উদাহরণ।

এই বই-এর পাতায় শ্রীযুক্ত লিকির বাড়ীতে নানা অদ্ভুত জীবজন্তুর কথা তোমরা পড়বে। হ্যালডেন সাহেবের বাড়ীতেও অমনি নানা অদ্ভুত জীবজন্তু আছে। না, না, ড্রাগন কোত্থেকে থাকবে, তবে ড্রাগনের সঙ্গে আত্মীয়তা থাকতে পারে এমনি দু'টি জন্তু আছে তাঁর বাড়িতে। তাদের নাম ফ্লসিহিল্‌ডে আর বেরেনিস। একটি বিড়াল আছে সেটি বদ্ধ কালা। কিন্তু ডিগবাজি খাওয়ায় তার জুড়ি মেলা ভার। কোনো দিন বিলেতে গেলে ওঁর বাড়িটা দেখতে ভুলো না কিন্তু।

এই দেখো, আসল কথাটাই বোধ হয় তোমরা ভুলে গেছ? উঁহু, জিন কি ড্রাগনের কথা নয়! আসল কথাটা হচ্ছে, ইওরোপের যুদ্ধ ত এবার শেষ হয়ে গেছে। হিটলার এখন জার্মানীর কর্তা ত নন-ই; তাঁর ভাগ্যে যে কি ঘটেছে, কে জানে! এবার হ্যালডেন সাহেব তোমাদের জন্য গল্প লিখতে সুরু করবেন। যদি না লেখেন ত চিঠি লিখে মাঝে মাঝে তাঁকে বিরক্ত কোরো। ঠিকানা? তাঁর আবার ঠিকানা কি? জে, বি, এস, হ্যালডেন, ইংলণ্ড—এই ঠিকানাই ত যথেষ্ট!

—অনুবাদক

ইঁদুর-ধরা কল

এক যে ছিলেন···

রাজা কিন্তু নয়, শাকসব্জীওলা। নাম তাঁর স্মিথ, লণ্ডন শহরের ক্ল্যাপহামে তাঁর মস্ত দোকান। চারটি তাঁর ছেলে। বড় ছেলের নাম জর্জ—তখনকার রাজারও ছিল ঐ নাম। ছেলে বড় হলে দোকানের মালিক হবে তাই তিনি তাকে এক নাম করা উদ্ভিদবিদ্যা শেখাবার স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। জর্জ ক'দিনের মধ্যেই একশ' সাতান্ন রকমের বাঁধাকপি আর চুয়াল্লিশ রকমের লেট্যুসের বিষয় সব কিছু শিখে ফেলল। এবার তাকে পাঠানো হল এক প্রাণীবিদ্যা শেখাবার স্কুলে। এখানেও কদিনের মধ্যে সে শাকসব্জীতে কতরকমের পোকা হয়, কি রকম করে তাদের নষ্ট করা হয়, এই সব শিখে ফেলল। তাকে জিজ্ঞেস করলে সে গড়গড় করে বলতে পারত—বাঁধাকপিতে সবশুদ্ধ সাতাত্তর রকমের পোকা হয়। ক্ষুদে ক্ষুদে সবজে পোকাগুলোকে মারতে হলে বাঁধাকপির পাতার উপর সাবানগোলা জল ছিটিয়ে দিতে হবে, গায়ে দাগ কাটা যে-গুলো তাদের জন্যে চাই তামাক পাতার জল। কিন্তু পাটকিলে রঙের মোটা মোটা পোকাগুলো নিয়েই যত মুস্কিল। সাবান আর তামাক পাতার জলে ওদের কিছু হবে

না। ওদের মারতে হলে নুন গোলা জল দিতে হবে। এ সব শিখেছিল বলেই জর্জ শাকসব্জীর বাজারে খুব নাম করে ফেলল। লণ্ডন শহরে কেউ বাঁধাকপি কিনতে হলেই ওর দোকানে গিয়ে হাজির হত। কেন না, পোকা নেই এমন কপি ওর দোকানে ছাড়া আর কোথায় মিলবে? অন্য সবাই ত আর তার মত পোকা মারবার উপায় জানত না।

স্মিথ সাহেবের অন্য তিনটি ছেলের কথা বলছি। মেজ ছেলের নাম জিম, নাম ছিল জেমস নিশ্চয়ই, কিন্তু সবাই মুখে মুখে নামটাকে একটু ছোট করে নিয়েছে। সে স্কুলে ইংরেজী প্রবন্ধ লেখায় খুব নাম করে ফেলল, গোটাকয়েক ভারী ভারী সোণার মেডালও পেল। শুধু বইয়ের পোকা ভালো ছেলে হয়েই সে রইল না, সে ফুটবল খেলায়ও খুব নাম করল। সে হল স্কুলের টিমের ক্যাপ্টেন। তার উপর ছেলেদের মধ্যে তার আর একটা ব্যাপারেও খুব পসার জমে গেল। দুষ্টু বুদ্ধিতে সে ছিল ওস্তাদ। ছেলেদের ত নানা ফন্দিফিকির করে সে নাস্তানাবুদ করত, এমন কি বদরাগী মাষ্টারের দলকেও সে ছেড়ে কথা কই ত না! একদিনের একটা ব্যাপার বলি শোন। অঙ্কের মাষ্টার তখনো ক্লাসে আসেন নি। তাঁর চক আর ডাষ্টার রেখে গেছে বেয়ারা। জিম উঠে গিয়ে সেই চকের ভেতর এমন ভাবে একটা দেশলাইয়ের কাঠির বারুদটুকু পুরে রাখল যে, চকখানা হাতে নিয়ে কিছু বোঝবার উপায় নেই। এখন বাজারে তোমরা যে দেশলাই দেখতে পাও, এ দেশলাই

কিন্তু সে রকমের নয়। সিনেমায় তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ জুতোয় ঘসে দেশলাই জ্বালাচ্ছে একটা লোক। ঠিক সেই রকমের এক বাক্স দেশলাই জিম যোগার করেছিল। এখন মাষ্টার মশাই এসেই বোর্ডে অঙ্ক কষাতে শুরু করলেন; দু একটা অঙ্ক লিখেছেন, হঠাৎ এক কাণ্ড। ফস্ করে জ্বলে উঠল আগুন, মাষ্টার মশাই চিৎকার করে উঠলেন, সে ঘণ্টায় নিশ্চয়ই আর অঙ্ক কষানো হল না। আর একদিন জিম ফরাসী শেখার ক্লাসে ডেস্কের প্রত্যেকটা দোয়াতে কালির মধ্যে খানিকটা করে মেথিলেটেড স্পিরিট ঢেলে দিল। সেদিন ফরাসী ব্যাকরণের পরীক্ষা। ফরাসী ব্যাকরণ কিন্তু ইংরেজী ব্যাকরণ থেকে অনেক শক্ত। কতকটা সংস্কৃতের মত আর কি! ছেলেদের বুক ভয়ে দুর দুর করছিল, যা শক্ত প্রশ্ন মাষ্টার মশাই দিয়েছেন! কিন্তু এ কি! কলমে যে কালি উঠছে না! মাষ্টার মশাই তাড়াতাড়ি ছুটে এসে নিজে পরীক্ষা করে দেখলেন, তাই ত, দোয়াত ভরতি কালি, অথচ নিবে এক ফোঁটাও উঠছে না। তিনি দোকান থেকে বড় এক বোতল কালি কিনিয়ে আনালেন, কিন্তু তখন আর পরীক্ষা নেয়ার সময় নেই! ঘণ্টা বেজে গেছে।

জিম এমনি ধারা জ্বালাতন সবাইকেই করত, কিন্তু তার ভেতরে উঁকি মারত তার বিজ্ঞান-পড়া বুদ্ধি। মাষ্টার মশাইয়ের ডেস্কে মরা ইদুর রাখা বা তালার ভিতরে কিছু পুরে নষ্ট করে দেয়া—এ সব দুষ্টু বুদ্ধি তার কখনও দেখা যায় নি।

এবার সেজ ছেলের কথা। তার নাম চার্লস। অঙ্কে আর ইতিহাসে বেশ ভালো। খেলা ধূলায়ও মন্দ নয়, স্কুলের ক্রিকেট টিমের সে একজন চাঁই। কিন্তু সব থেকে ভালো সে রসায়ন বিদ্যায়। কি করে বিশ্রী গ্যাস তৈরী করা যায় সে জানত কিন্তু জিমের মত লোক জ্বালাবার ইচ্ছে তার ছিল না। আর মাষ্টার মশাইদের জ্বালাতন করলে তাঁরা তাকে যে রসায়ন বিদ্যার ল্যাবরেটরীতে ঢুকতে দেবেন না একথাও ভালো করে তার জানা ছিল। তাই সে দিব্যি শান্তশিষ্ট হয়ে লেখাপড়া করে যেত।

ন' ছেলের নাম জ্যাক। পড়াশুনো বা খেলাধূলোয় কোনোটায়ই সে বিশেষ সুবিধে করতে পারল না। বল সোজা করে মারতে সে কোনোদিন পারে নি। একবার ক্রিকেটের মাঠে ফিল্ডিং-এর সময় সে দিব্যি নাক ডাকাতে শুরু করেছিল। তারপর টিম থেকে তাকে ছেঁটে দেয়া হল। সে কিন্তু তাতে খুশিই হল। কি দরকার? ততক্ষণ সে বাড়ী এসে রেডিওর সেট তৈরী করবে। এ দিকে কিন্তু তার মাথাও খেলত ভাল। তার দিদিমা মাটিলডা একেবারে থুত্থুরে বুড়ী। চোখে দেখতে ত পানই না, কানেও শুনতে পান না। জ্যাক অনেক চেষ্টা করে তাঁর জন্য একটা ইয়ার-ফোন তৈরী করে দিল। তোমরা নিশ্চয়ই দু-একজন কালা ভদ্রলোকের কাছে ইয়ার-ফোন দেখেছ, কেউ কোনো কথা বললে তাঁরা যন্ত্রটা বার করে কানে লাগিয়ে শোনেন। বুড়ী দিদিমা ত আহ্লাদে

আটখানা! তিনি নাকি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের পর এত আনন্দ আর বহুদিন পাননি। জ্যাক আরও নানা জিনিস তৈরী করে ফেলল। একবার সে একটা এমন যন্ত্র তৈরী করল যাতে করে তাদের বাড়ীতে ইলেকট্রিক আলোর জন্য আর কোম্পানীকে পয়সা দিতে হবে না। জ্যাক যন্ত্রটা তৈরী করে চুপি চুপি তারে লাগিয়ে দিল। বাড়ীর কেউ জানতেও পারল না। এদিকে মাস চলে গেল, ইলেকট্রিক বিল আর আসেই না। স্মিথ সাহেব ভাবলেন, নিশ্চয়ই কোনো গোলমাল হয়েছে। তিনি ইলেকট্রিক কোম্পানীকে চিঠি লিখলেন, কোম্পানী থেকে মিস্ত্রী এল, এল ইঞ্জিনীয়ার। তারাও লাইন পরীক্ষা করলেন, লাইন ঠিকই আছে, আলো জ্বলছে, অথচ মিটারে কিছু ওঠেনি। কি ব্যাপার! ওরা চলে গেলে জ্যাক তার বাবাকে যন্ত্রের কথা বলল। বাবা রেগে বললেন, "এ-ত চুরি! কোম্পানীর কাছ থেকে আমরা একমাসের ইলেকট্রিক চুরি করেছি।"

জ্যাক বলল, "বারে চুরি করব কেন। আমরা লাইন থেকে ধার নিয়েছি ইলেকট্রিক, আবার লাইনকেই শোধ করেছি ধার। কোম্পানীর এক পয়সার ক্ষতি হয় নি।"

বাবা কি সে কথা শোনেন! তিনি যন্ত্রটা ভেঙ্গে চুরে ফেলে, কোম্পানীকে পাঠিয়ে দিলেন টাকা। জ্যাক বেচারা আর কি করবে বল?

হাঁ, বলতে ভুলে গেছি, স্মিথ সাহেবের এক মেয়েও ছিল।

তার নাম লুসিলি। কিন্তু আমাদের গল্পে তার বিশেষ আনাগোনা নেই বলে তার কথা এখন বল্লুম না!

তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ, আসল গল্প কখন শুরু হবে।

আসছে, এবার আসল গল্প, শোন।

সেবার লণ্ডনে ভয়ানক হুলুস্থুল ব্যাপার। ডকগুলোতে ইঁদুরের উৎপাত শুরু হয়েছে। সে আবার যে সে ইঁদুর নয়, মস্ত বড় বড় ইঁদুর, ছুরির মত ধারাল তাদের দাঁত। এদের পূর্ব্বপুরুষ নাকি চীন দেশের হংকং বন্দর থেকে চা, আদা, সিল্ক আর চালের বস্তার সঙ্গে একদিন লণ্ডনের ডকে এসে হাজির হয়েছিল। তখন সংখ্যায় কম ছিল বলেই চুপ করে কাটিয়েছে, কেউ টেরও পায়নি। কিন্তু এখন তারা দলে ভারী হয়ে ভীষণ উৎপাত শুরু করল। তোমরা জানো বোধ হয়, ইংলণ্ডে যা শস্য হয়, তা দিয়ে ইংলণ্ডের সব লোকের খাওয়া চলে না। তাই যব আসে কানাডা থেকে, হল্যাণ্ড থেকে আসে পনীর, নিউজিল্যাণ্ড থেকে আসে ভেড়ার মাংস, আর্জেন্টিনা আরও নানা জায়গা থেকে আরও কত কি আসে। কিন্তু এই ইঁদুরের পালের জ্বালায় এই সব খাবার আর ইংলণ্ডের লোক চোখে দেখতে পেত না। ডকে এসে জাহাজ ভিড়তে না ভিড়তেই সব খেয়ে সাবাড় করে দিত। তারপর তারা লেগে গেল নিজেদের বাড়ী সাজাতে। পারস্য দেশের গালিচার টুকরো নিয়ে গিয়ে তারা গর্তগুলোর মেঝেয় পাতল, চীনে সিল্কের টুকরো দিয়ে তৈরী

ইঁদুরদের আবার রাজা, তাই না ?—পৃঃ ৭

লণ্ডন ডকের মেজকর্তা—পৃঃ ৯

করল পাপোষ। ভেবে দেখ ইংলণ্ডের লোকের কি অবস্থা। খাবার ত গেলই, সাজ সজ্জার উপায়ও রইল না।

এবার টনক নড়ল লণ্ডনের পোর্ট অফিসের বড় কর্তার। বিদেশ থেকে যে-সব মাল আসে, সে গুলো ঠিক ঠিকানায় না পৌঁছানো পর্যন্ত তাদের দায়িত্ব থাকে এই বড় কর্তার উপর। তিনি ত এবার খেসারত দিতে দিতে পাগল হয়ে গেলেন। কোনো উপায় না দেখে তিনি ডেকে পাঠালেন লণ্ডন শহরের বিখ্যাত ইঁদুর-ধরিয়েদের। কিন্তু তারা এসে কল পেতে কয়েক-শ' মাত্র ধরল। ইঁদুরদের রাজা কল পাতবার কথা জানতে পেরে আগেই সবাইকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তোমরা বোধহয় হাসছ, ইঁদুরদের আবার রাজা! সত্যিই ওদের একজন রাজা ছিলেন, তিনি থাকতেন সব চেয়ে বড় এক গর্তে। ইঁদুররা তাঁকে বেশ আরামে রেখেছিল। তিনি খেতেন সুইজার-ল্যাণ্ডের চকোলেট, ফ্রান্সের টার্কী আর আলজিয়ার্সের খেজুর। কিন্তু তাই বলে শুধু আরামে বসে বসে খাওয়াই তাঁর কাজ ছিল না। কেউ ফাঁদে ধরা পড়লে রাজা দূত পাঠিয়ে সবাইকে সাবধান করে দিতেন। তাঁর এক বিরাট সৈন্যবাহিনীও ছিল। তা বিরাট বই কি! দশ হাজার তরুণ সাহসী ইঁদুর নিয়ে সে-দল তৈরী। এই সৈনিকরা কুকুর বা বিড়ালের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ভয় পেতনা। একটা কুকুর হয় ত দু-তিনটে ইঁদুর মেরে ফেলতে পারে, কিন্তু হাজার হাজার ইঁদুর যদি তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাহলে বেচারার কি দশা হয় তোমরা বুঝতেই

পারছ। এই সৈন্য দল ছাড়াও একদল ছিল ইঞ্জিনিয়ার। তাদের দাঁতের ধার পরীক্ষা করে নেয়া হত। তারা ইঁদুর ধরা কলের লোহার জাল কেটে বার করে আনত বন্দীদের।

একমাস হল, ইঁদুর-ধরিয়েরা কল পাতে, কিন্তু ইঁদুর আর কলে ধরা পড়ে না। একদিন ডকের কর্তা চটে গিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিলেন। তিনি ত আর জানতেন না যে, ইঁদুরদের রাজা তাঁর প্রজাদের সাবধান করে দিয়েছেন। তিনি ভাবলেন, ওদের কলগুলো কোন কাজের নয়। এদিকে একমাসে ক্ষতির পরিমাণ একটুও কমে নি। বরং বেড়েছে। ইঁদুররা এই একমাসে বেড়াল মেরেছে একশ একাশিটা আর কুকুর উনপঞ্চাশটা; আর আহত যে কত করেছে তার ঠিক নেই। এখন কুকুরগুলো দেখা ত দূরের কথা, ইঁদুরের গন্ধ পেলেই পালায়। ডকের কর্তা এবার লোক পাঠালেন শহরের যত ওষুধের দোকানে, যত রকম ইঁদুর মারবার বিষ এনে তারা হাজির করল। বিষ মাখিয়ে ডকে ডকে খাবার ছড়িয়ে দেয়া হল। ইঁদুরের রাজা গুপ্তচরের মুখে খবর পেয়ে হুকুম দিলেন, তাঁর প্রজারা কেউ পিপে বা বাক্সের খাবার ছাড়া অন্য খাবার যেন না ছোঁয়। ফলে কয়েকটা লোভী ইঁদুর মারা পড়ল, যেমন রাজার হুকুম তারা মানে নি, শাস্তিও তার পেল।

কর্তা এবার এক সভা ডাকলেন। সবাইকে তিনি বললেন, "একটা উপায় যে করেই হোক আমাদের বার করতে হবে।"

মেজ কর্তা পরামর্শ দিলেন, কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়া হোক। যে কথা সেই কাজ। পরদিনই লণ্ডন শহরের বড় বড় যত কাগজ, যেমন ডেইলি মেল, টাইমস, ডেইলি হেরাল্ড, ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ড সব কাগজে প্রথম পাতায় বিজ্ঞাপন বেরুল। শহরে সাড়া পড়ে গেল। বিজ্ঞাপনে কি লেখা ছিল জান? ইঁদুরের হাত থেকে যে ডক বাঁচাতে পারবে তাকে এক লাখ পাউণ্ড মোহর পুরস্কার দেয়া হবে। আর কর্তা তার সঙ্গে দেবেন নিজের মেয়ের বিয়ে। বিজ্ঞাপনে বেরুল এক লাখ পাউণ্ড মোহরের ছবি আর কর্তার মেয়ের ফটো। স্মিথ সাহেবের বাড়ীতে সবাই পড়ল এই বিজ্ঞাপন, শুধু দিদিমা বুড়ি ম্যাটিলডা শুনল জ্যাকের কাছ থেকে।

হাজার হাজার লোক চিঠি পাঠাল কর্তার কাছে। পোষ্টাফিস থেকে তিন জন নতুন পিয়ন রাখা হল সেই সব চিঠি বিলি করবার জন্য। ফোন আসতে লাগল ঘন ঘন, মনে হল এইবার বুঝি তারই গলে যায়! মাসের পর মাস ধরে কত লোক কত রকম চেষ্টা করল। রাসায়নিক এলেন, যাদুকর এলেন প্রাণীতত্ত্ববিদ এলেন, কিন্তু ইঁদুরের উৎপাত সমানই রয়ে গেল। বরং তাদের জন্য লণ্ডনের ডক অকেজো হয়ে পড়ল। জাহাজ আর সেখানে ভেড়ে না। জাহাজ মাল নামাতে চলে যায় লিভারপুলে বা সাদামপ্টনে। ডকের এতে বেশ লোকসান হল।

চারভাই এতদিন চুপটি করে ব্যাপারটা দেখছিল, এবার

তারাও ইঁদুর তাড়াবার ফন্দী-ফিকির বার করবার জন্য মাথা ঘামাতে শুরু করল। জিম ভাবলে, এমন একটা কল সে তৈরী করবে, যেটাকে ইঁদুররা কল বলে চিনতেই পারবে না। মাষ্টার মশাইদের ফাঁকি দিয়েছে সে স্কুলে, আর এই ইঁদুর গুলোকে পারবে না! ডকে এখানে ওখানে কতগুলো পুরনো টিন পড়েছিল, তার একটা দিয়ে সে ইঁদুর-ধরা কল তৈরী করল। একটা কৌটো, তার ভেতরে থাকবে খাবার। ইঁদুর খাবারের গন্ধে টিনের ঢাকনির উপর উঠলে আর রক্ষে নেই। তাকে কৌটোর মধ্যে বন্দী হতে হবে। সে বাবার কাছ থেকে দশ পাউণ্ড ধার নিয়ে কাজ শুরু করল। কিন্তু একা ত আর অতগুলো কল তৈরী করা যায় না! তাই বিল রবিনসন বলে একজন মিস্ত্রীকে সে মাইনে করে রাখল। দেখতে দেখতে একহাজার তিনশ চুরানব্বুইটি কল তৈরী হল, তার মধ্যে সতেরোটি অবশ্য খারাপ হয়েছিল তাই কাজে লাগল না।

এবার বাবার ঘোড়ার গাড়ীখানা জুতে তাতে কলগুলো চাপিয়ে সে গেল মেজ কর্তার সঙ্গে ছাখা করতে। মেজকর্তা বড় যে সে লোক নন। তিনি একজন ডিউক, প্রকাণ্ড তাঁর জমিদারী। তিনি কলগুলো দেখে বললেন, “এই কটা কলে আর কত ইঁদুর ধরা পড়বে হে! যাকগে, একটা ডকে ত পেতে দেখি, কি হয়।” ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া ডকে কলগুলো পাতা হল। এখানে জামাইকা ও তার আশে পাশের দ্বীপগুলো থেকে

চিনি, রাম মদ, গুড় আর কলা বোঝাই হয়ে জাহাজ আসে। আমার মনে হয় ওই ডকটা পছন্দ করে ওরা ভুল করল। কেননা, এখানে ছিল সেরা ইঁদুরের দল। পিপের থেকে গুড় বা মদ খেতে হলে বেশ চালাক চতুর ইঁদুরের দরকার কিনা ভেবে দেখ।

যাক কল ত পাতা হল। পনীর আর মাংসের টোপ দেয়া হল তার সঙ্গে। প্রথম রাতে ধরা পড়ল নশো আঠারোটি ইঁদুর। জিম ত খুব খুশি। মোহরগুলো এবার সে পেল বলে। কিন্তু দ্বিতীয় রাতে মোটে চারটি ধরা পড়ল, তৃতীয় রাতে দুটি! এবারও রাজা সবাইকে সাবধান করে দিলেন। চারদিনের দিন জিম বুদ্ধি করে ভিক্টোরিয়া ডকে নিয়ে গেল কলগুলি। কিন্তু চারটির বেশি ইঁদুর ধরা পড়ল না। জিম আর কি করে? মনের দুঃখে বাড়ী ফিরে এল। সময় ত যথেষ্টই গেছে, তার উপরে বাবার কাছে তার দশ পাউণ্ড দেনা! ওদিকে বন্ধুরাও ঠাট্টা করে তার নাম রাখল, 'টিনের ইঁদুর।'

চার্লসের কাণ্ড কারখানাই আলাদা। সে অনেক খেটে খুটে একটা বিষ তৈরী করল, তার গন্ধ ত নেই-ই, আস্বাদও নেই। আমি তোমাদের কিন্তু বিষটার নাম বা কি করে সেটা তৈরী হয়, বলব না। আমি বেশ জানি, তোমরা কারো ক্ষতি করবে না, কিন্তু যদি কোনো খুনে এই গল্প পড়ে সেই বিষ দিয়ে মানুষ খুন করে, তখন কি হবে বল ত? না হয় নাই শুনলে বিষের নাম। সে এবার বাবার কাছ থেকে

কুড়ি পাউণ্ড ধার করে পনীর কিনে তাতে ভাল করে সেই বিষ মাখাল। তারপর পনীরের এক এক টুকরো ছোট ছোট রঙ-বেরঙের পিসবোর্ডের বাক্সে পুরে সবগুলো ডকে এখানে ওখানে রেখে এল। কি গন্ধ পনীরের! সমস্ত ডক অঞ্চলের হাওয়া পনীরের গন্ধে ভারী হয়ে এল। চার্লস ভাবল, গন্ধে মানুষেরই জিভের জল ঝরে, ইঁদুর ত কোন ছার! আজ রাতে আর একটিকেও গর্ত্তে ফিরে যেতে হবে না।

সূর্য্য ডুবল, অন্ধকার হয়ে এল, ইঁদুররা দলে দলে বেরিয়ে এল গর্ত ছেড়ে। কি চমৎকার পনীরের গন্ধ! ভুর ভুর করছে! চারদিকে খোঁজ পড়ে গেল। সন্ধানও মিলল, বাক্সে বাক্সে সাজানো রয়েছে টুকরো টুকরো পনীর, দেখতে দেখতে বাক্সকে বাক্স সাবাড়। দু-একটা ধাড়ি ইঁদুর একটু সন্দেহ করেছিল। কে তাদের কথা শোনে। এমন কি রাজাকে পর্যন্ত কয়েক টুকরো দেয়া হল খেতে। রাজা তখন সবে বাদাম আর সামন মাছ দিয়ে তাঁর ভোজ সমাধা করেছেন, পেট একেবারে টৈটুম্বুর, তাই তিনি পনীর তুলে রাখলেন। সকালে খাবেন। এদিকে কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হল বিষের কাজ। রাত তিনটের সময় ঢলে পড়ল দলে দলে ইঁদুর। রাজার কেমন সন্দেহ হল। তিনি দূত পাঠিয়ে সবাইকে জানালেন, কেউ যেন পনীর আর না খায়।

এখন একটা ছিল খুনে ইঁদুর। তার নিজের বাচ্চাদের খেয়ে ফেলবার জন্য তার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। রাজা তাকে

খানিকটা পনীর খাইয়ে দিলেন। ইঁদুরটা মরে যেতেই আবার আর একদল দূত পাঠান হল। পরদিন ভোরে চার হাজার পাঁচশ চৌদ্দটি মরা ইঁদুর পাওয়া গেল। তাছাড়া আরও কত যে গর্তে মরে রইল তার ঠিক নেই। বড়কর্তা চার্লসকে ডেকে বললেন, "তুমি টাকা নাও, যত খুশি পনীর কিনে এনে ছড়িয়ে দাও, দুদিনেই ব্যাটারা অক্কা পাবে," চার্লস টাকা নিয়ে এবার বাজার থেকে কয়েক মণ পনীর কিনে আনল। লণ্ডনের প্রতি ডক রঙ-বেরঙের বাক্সে ভরে গেল। কিন্তু দুদিন পরে দেখা গেল আট হাজার বাক্সের মধ্যে দুটি শুধু খোলা হয়েছে। এবারও ইঁদুরের রাজা চার্লসকে বোকা বানিয়ে দিলেন। বেচারা চার্লস আর কী করে? মনের দুঃখে সে বাড়ী ফিরে এল। কদিন ধরে এত পনীর ঘাঁটাঘাঁটি করে চার্লসের গা থেকে পর্যন্ত পনীরের গন্ধ বেরুচ্ছিল। কেউ আর তার কাছে ঐ বিদকুটে গন্ধে যেতে পারেনা। স্কুলে মাষ্টার মশাইরা তাকে গন্ধের জন্য স্কুলে ঢুকতে দিলেন না। এমন কি, বাড়ীতে কয়লা রাখবার ছোট্ট ঘরটায় তাকে দিনের পরদিন কাটাতে হল। পুরো একমাস রইল এই বোটকা গন্ধ। তারপর অনেক সাবান মাখার পর একদিন মিলিয়ে গেল। চার্লস আবার শুরু করল পড়াশুনো, স্কুলে যাওয়া।

জ্যাক ভাবল, সেও একবার চেষ্টা করে দেখবে। অনেক মাথা ঘামিয়ে সে এক ফন্দি বার করল ইঁদুর তাড়াবার। কিন্তু অনেক টাকার ব্যাপার। স্মিথ সাহেবের কাছে সে

তিরিশ পাউণ্ড ধার করল। কিন্তু তিরিশ পাউণ্ডে কি হবে? সে আমার কাছে এসে বলল, কয়েক পাউণ্ড ধার ত দিতেই হবে, তার উপর ওর রেডিও সেট বিক্রি করে টাকা যোগার করার ভারও দিল আমার উপর। কি আর করি! ওর রেডিও সেট বিক্রি করে টাকার বন্দোবস্ত করে দিলাম। টাকা নিয়ে ছেলেটা কি করল জান? একরাশ উকো কিনে ফেলল। সচরাচর যে সব উকো বাজারে দেখ, সেগুলো নয়। খুব সরু লোহার তারের তৈরী উকো, ঝকঝক করছে, চোখের দৃষ্টি জোরাল না হলে মালুম হবে না। ঐ উকোগুলো নিয়ে সে গেল একটি বিস্কুটের কারখানায়, উকোগুলো ভিতরে পুরে দিয়ে তাকে লাখে লাখে বিস্কুট তৈরী করে দিতে হবে। রুটিওয়ালা ত অবাক! এমন বিস্কুটের কথা সে জন্মেও শোনে নি। যা হোক, টাকা যখন পাবে, রুটিয়ালা রাজি হল। বিস্কুট তৈরী করে ডকে ডকে ছড়িয়ে দেয়া হল। ইঁদুররা প্রথমটা একখানাও ছুঁল না, তারপর খেয়ে পরীক্ষা করে দেখল, না কিছু নেই। দেখতে দেখতে আর একখানা বিস্কুটও ডকে পড়ে রইল না। এদিকে জ্যাক সাতটা প্রকাণ্ড ইলেকট্রো-ম্যাগনেট যোগাড় করে রেখেছিল। ইলেকট্রো-ম্যাগনেট কাকে বলে জান? স্কুলে অনেক ছেলের কাছে এক একটা ছুরি থাকে, যার ফলাটা লোহার ছুঁচের উপর ছোঁয়ালে ছুঁচটা ওরই সঙ্গে ঝুলতে থাকবে। এর কারণ কি জান, ঐ ছুরির ফলায় চুম্বক লাগান আছে।

লোহা টেনে নেওয়াই হচ্ছে চুম্বকের কাজ। চুম্বকের ইংরেজী নাম হচ্ছে ম্যাগনেট। ইলেকট্রো-ম্যাগনেট আর কিছুই নয়, কতকগুলো চুম্বকের তারের সঙ্গে ইলেকট্রিক তার এমন ভাবে জুড়ে দেয়া হয় যে, সুইচ টিপে দিলেই আশে পাশে যত লোহার জিনিস আছে, সব ছুটে এসে সেই তারের সঙ্গে জুড়ে যাবে। জ্যাক এই ইলেকট্রো-ম্যাগনেটগুলো প্রতিটি ডকে এক একটা খাদ করে তার ভেতর বসিয়ে দিল। তারপর জুড়ে দিল ডকের বিজলী বাতির লাইনের সঙ্গে। এবার সুইচ টিপলে লোহার যা কিছু জিনিস ডকে আছে, সব এসে হুমড়ী খেয়ে ঐ খাদগুলোর মধ্যে পড়বে। কিন্তু এর জন্য চাই খুব জোরালো বিদ্যুৎ শক্তি। কাছেই ছিল টিউব রেলওয়ের বিজলীঘর। জ্যাক সেখানকার ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করল। তিনি জোগাবেন বিদ্যুৎ।

ডকের যত লোহার জিনিসপত্তর ছিল, সরিয়ে দেয়া হল, কিন্তু বে-মেরামতি জাহাজ নিয়ে হল মুস্কিল। সেগুলো আবার ইস্পাত আর লোহার তৈরী। বড়কর্তার হুকুমে, ওদের মোটা মোটা কাছি দিয়ে বেঁধে দেয়া হল, যাতে সহজে না খাদে গিয়ে পড়তে পারে। ডকের সবাই সেদিন ক্যানভাসের জুতো পায়ে দিয়ে এসেছিল, লোহার একটু নাম গন্ধ থাকলে কি বিপদ ঘটে কে জানে! তবে মেজকর্তা কিন্তু তার সাবেক জুতো পরেই এলেন, তাঁর ত আর ভয় নেই। তিনি মস্ত ডিউক, তাঁর জুতোর পেরেকটি পর্যন্ত সোণা দিয়ে তৈরী।

ঢং ঢং করে বাজল দেড়টা, টিউব রেলওয়ের ঘন্টি এবার থেমে গেছে। কণ্ডাক্টার আর ড্রাইভাররা চলেছে বাড়ী ফিরে। এবার রেলওয়ের ইঞ্জিনীয়ার বিজলী ঘরে গিয়ে সুইচ টিপে দিলেন। ডক আর বিজলী ঘরের মধ্যে আগেই একটা লাইন করা হয়েছিল। সারাদিনরাত টিউব রেলওয়ে চালাতে যতখানি শক্তি লাগে, ততখানি শক্তি চালিয়ে দেয়া হল একটা ম্যাগনেটে। দেখতে দেখতে দু-চারটে মরচে-ধরা পেরেক, ভাঙা টিন উড়ে এসে পড়ল খাদে। তারপর এল পালে পালে ইঁদুর, ওদের পেটের ভেতরে বিস্কুটের সঙ্গে লোহার উকো গেছে, চুম্বকের টানে না এসে যো কি বল ? এক মিনিটে খাদ ভরে গেল। তারপর একে একে প্রতি ডকের ম্যাগনেটগুলোতে বিদ্যুৎশক্তি চালিয়ে দেয়া হল। ইঁদুররা ভয়ে গর্তে গিয়ে লুকোল, কিন্তু উপায় কি ? পেটের ভেতরে রয়েছে লোহা, চুম্বকের টানে বেরিয়ে আসতে ত হবেই।

ইঁদুরদের রাজা সবে ডিনার শেষ করেছেন তখন। না, আজ আর তেমন জুত-সই হয়নি খাওয়া। ডকে জাহাজই ভিড়ছে না তা সুইজারল্যাণ্ডের চকোলেট আর হল্যাণ্ডের পনীর কোথায় মিলবে। তিনি আজ ডকে-পাওয়া বিস্কুট দিয়েই ভোজ সমাধা করেছেন। এমন সময় খবর এল, বিপদ উপস্থিত। গর্ত থেকে প্রজারা বেরিয়ে গিয়ে খাদে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে, আর উঠছে না। রাজা সত্যিই চিন্তায় পড়লেন। তাই ত, কি ব্যাপার! তাড়াতাড়ি দুজন গুপ্তচর পাঠালেন। কিন্তু

বেচারা জ্যাসিন্তো !—পৃঃ ২৮

বহুক্ষণ কেটে গেল, তারা আর ফেরেই না। কি করেন, শেষে নিজেই বেরিয়ে পড়লেন রাজপ্রাসাদ ছেড়ে। উপরে উঠে যেই তিনি পা বাড়িয়েছেন, অমনি কে যেন তাঁর শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল। এত চেষ্টা তিনি করলেন প্রাসাদে ফেরবার, কিন্তু তা আর হল না।

ভোর হয়ে আসছে, এবার টিউব ট্রেণ ছাড়বার সময় হয়ে এল। নদী থেকে আগেই পাম্প করে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা ভর্ত্তি করে জল রাখা হয়েছিল। সেই জল খাদগুলোর ভেতরে ছেড়ে দেয়া হল। দেখতে দেখতে জলে খাদগুলো ভর্‌তি হয়ে গেল। ইঁদুররা ডুবে মরল। পরদিন যখন মরা ইঁদুর তোলা হল, ওজন হল তাদের, দেড়শ' টন। তোমরা ত অঙ্ক জানো, কষে দেখ ত ক'মন ক'সের হয়। কত মারা গেল? তা কি করে বলি? অত ইঁদুর একটা একটা করে গুণে দেখা ত আর চারটিখানি কথা নয়!

দু-একটা ছোটো খাটো দুর্ঘটনাও যে না ঘটল তা নয়। আলফ টিম্মিন্‌স বলে ছিল এক পাহারাওলা। সে-রাতে ডকে তার পাহারা দেয়ার পালা। সে বেচারা অতশত জানে না। সে এখন সেই লোহার নাল-দেয়া পাহারাওলাদের ভারী বুট পরে এসেছে। ব্যস, আর পায় কে! টান, টান চুম্বকের টান! একেবারে খাদের কাছে এসে সে কোনো রকমে বুট দু'টো খুলে ফেলল। জুতো খুললে কি হবে? এ দিকে দু'টো ইঁদুর তার পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দু'টো শক্ত করে কামড়ে

ধরেছে, বেচারী ছাড়াবার কত চেষ্টা করল, কিন্তু যো কি বল? ওধারে চুম্বকের শেষে টান ইঁদুর শুদ্ধ আঙ্গুল দু'টোই খাদের মধ্যে টুপ করেখসে পড়ল। আর একটি পাহারাওলার কিন্তু ভাগ্য খুব ভালো। গতবারের যুদ্ধে তার মগজে কামানের গোলার এক টুকরো লোহা ঢুকে গিয়েছিল। কত বড় বড় ডাক্তার চেষ্টা করেও তা বার করতে পারেন নি। এবার চুম্বকের টানে সেই লোহার টুকরোটুকু সোডার বোতলের ঢাকনির মত ছিটকে পড়ল। এতদিনের মাথা ধরা সারল তার।

পরদিনও একশ' টন ওজনের ইঁদুর মারা পড়ল। রাজাই মরে গেছেন, এখন আর কে তাদের সাবধান করে দেবেন? তারপর দিন পঞ্চাশ টন। বাকি যে ক'টি ইঁদুর ছিল, তারা ভীষণ ভয় পেয়ে ডক ছেড়ে পালিয়ে গেল। কেউ কেউ চাপল বিদেশী জাহাজে। কেউ বা ঢুকল লণ্ডন শহরে। ডকে আর ইঁদুরের উপদ্রব রইল না।

জ্যাক একলাখ মোহর পুরস্কার ত পেলই, আর সঙ্গে সঙ্গে বড় কর্তার মেয়ের সঙ্গে খুব ধূমধামে তার বিয়ে হয়ে গেল। অত টাকা পেয়ে পায়ের উপর পা দিয়ে আরামে বসে থাকবার ছেলে সে নয়। লণ্ডনের রেডিও স্টেশনকে বলে বি, বি, সি। সেখানে সে ইঞ্জিনিয়ারের চাকরী পেল। এখন আর তাকে পায় কে! কত নতুন নতুন যন্ত্র সে আবিষ্কার করেছে তার লেখাজোকা নেই। তাই বলে তার ভাইদের সে ভোলেনি। জিম আর চার্লস দুজনকেই সে সেই একলাখ

মোহর থেকে কিছু টাকা ভাগ দিল। জিম তার টাকা দিয়ে কিনল একটা যাদু দণ্ড। এখন সে একজন বিখ্যাত যাদুকর। চার্লস গেল কলেজে পড়তে। সেখান থেকে বেরিয়ে সে এখন এক কলেজে কেমিস্ট্রি পড়াচ্ছে। আমিও এক কলেজে পড়াই কিনা, আমার সঙ্গে তার খুব ভাব আছে। তার কাছেই জিম আর জ্যাকের খবর পাই। বেশ সুখেস্বচ্ছন্দে আছে সবাই।

সাপের সোণা-বাঁধানো দাঁত

কি বিদ্‌ঘুটে নাম !

পাওলো মারিয়া এনকারনাচাও এস্‌প্লেনডিডো !

কোন্‌ জাতের লোক বলত ! থাকত ব্রেজিলের মানাওসে। —অমন লম্বা আর বিশ্রী নাম হলে কি হবে, লোকটা কিন্তু খুব পয়সাওলা। একটা ছিল তার সোণারখনি, আর একটা রূপোর।

তোমরা হয়ত ভাবছ, যার সোণার খনি আছে, তার রূপোর খনির কথা না বললেও তোমরা বুঝতে পারতে লোকটা পয়সাওলা। কিন্তু এটা তোমরা নিশ্চয়ই জানো না, সোণার খনি থেকে সোণা তুলতে যত খরচ হয়, অনেক সময় খনি থেকে তার অর্ধেকও উঠে আসেনা। অবশ্য, এই লোকটার বেলায় কিন্তু তা হয় নি। এস্‌প্লেনডিডো—আমরা কিন্তু এখন তার নামটাকে ছেঁটে ছোট করে নেব। হাঁ কি বলছিলাম, এস্‌প্লেনডিডো খনি থেকে বেশ দু'পয়সা করে ফেলল। তবে অত পয়সা হলে কি হবে? লোকটার মন ভারী নীচু। সে খনির মজুরদের দিনভোর খাটিয়ে তাদের মজুরী কিন্তু খুব কম দিত! মজুররা তার উপর খুব চটে গিয়েছিল। কেউ তাকে মনিব বলে ভক্তি ত করতই না, বরং আড়ালে গাল দিত।

এখন এই মস্তবড় পৃথিবীতে হু'রকমের পয়সাওলা লোক দেখতে পাওয়া যায়। একদলের মন থাকে খুব উঁচু, তাঁরা টাকা দিয়ে হাঁসপাতাল খোলেন, নয়ত স্কুল করে দেন। আবার আর একদল আছে, তারা ওসব ভাল কাজের ধার দিয়েও যায়না। তারা টাকা দিয়ে কেনে হীরা, জহরৎ বা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া। তাদের টাকা সাধারণের কোন উপকারে আসে না। এস্‌প্লেনডিডো ছিল এই শেষের দলের লোক। কিন্তু মানাওসের মত জায়গায় বসে আর লণ্ডন শহরের বাবুয়ানা করবার স্থবিধে নেই। সেখানে ঘোড়দৌড়ের মাঠ ত নেই-ই, এমন কি মোটর চালাবার একটা ভাল রাস্তাও নেই। এস্‌প্লেনডিডোর একখানা গাড়ী ছিল বটে; কিন্তু সেখানা আমাদের শহুরে বড়লোকরা দেখলে হাসত নিশ্চয়ই। তাই বলে সে কম সৌখীন ছিল বলে তোমরা মনে কোরোনা। মানাওস জায়গাটা ছিল ঠিক আমাজন আর রিয়ো নেগ্রো নদীর মোহানায়। নৌকা চলাচলের খুব স্থবিধে এখানে। এস্‌প্লেনডিডো মোটরের সখ মেটাল তিন তিন খানা মোটর-বোট কিনে। সে আবার যে সে মোটর-বোট নয়, তার প্রত্যেকটা জিনিস রূপো দিয়ে তৈরী। তাছাড়া তার বউকে সে কিনে দিল দামী হীরে বসানো কংকন, এক একটার ওজনও কম হবে না। তার বাড়ীতেও জিনিসপত্র ছিল সব সোণার। ছাইদান, কাঁটা চামচ, টুথব্রাশ, সাবানের কেস, এমনকি দরজার হাতল পর্যন্ত তার খনি থেকে তোলা সোণায় তৈরী হত।

সপ্তাহে সে প্রত্যেক দিন এক একটা নতুন সোণার ঘড়ী ব্যবহার করত।

বাড়ীতে তার ছিল এক প্রকাণ্ড চিড়িয়াখানা। একটা পুকুরে জীইয়ে রাখা হয়েছিল নানা জাতের নানা দেশের কুমীর। ভাল করে তাকিয়ে দেখলে ভারতবর্ষের সাত সাতটা কুমীরের এখানে সাক্ষাৎ মিলত। জাগুয়ার ছিল সেখানে তিনটে, আর ছিল দু'টো আনাকোণ্ডা সাপ। ব্রেজিলে এই সাপ তোমরা দেখতে পাবে। এগুলো পাইথনের মত। এদের কামড়ে বিষ নেই, কিন্তু কাউকে জড়িয়ে ধরলে তার দফা রফা! একেবারে হাড়গোড় ভাঙা 'দ' করে ছেড়ে দেবে। এই সাপ-গুলো খুব ভালো সাঁতরাতে পারে।

এই দু'টো আনাকোণ্ডার মধ্যে একটা ছিল মাদী। সে প্রায়ই বড় বড় বিদঘুটে রকমের ডিম পাড়ত। রোজ সকালে প্রাতরাশের সময় সেই ডিম সেদ্ধ সোণার বাটিতে সোণার চামচে দিয়ে ভেঙে ভেঙে খেত আমাদের এস্‌প্লেনডিডো। কেউ যদি জিজ্ঞেস করত, সাপের ডিম কেন খাচ্ছ? সে একটু হেসে বলত: "তোমরা কি বুঝবে, মুরগীর ডিমের থেকে একশ' গুণে ভালো ওই ডিম! একটু চেখে দেখনা!" কিন্তু বন্ধুবান্ধব ডিমের বিদঘুটে চেহারা দেখে পিছিয়ে যেত। একবার একটা ভবঘুরে ছোকরা তিনটে ডিম খেয়েছিল। লোকে তাকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, "আহা! অমন ডিম আর হয় না! কি গন্ধ, কি স্বাদ! জীবনে ভুলব কিনা সন্দেহ।" কিন্তু

লোকে ওর কথা বিশ্বাস করল না। তারা জানত কিনা? ছোকরা এক সপ্তাহ একটুকরো রুটির পর্যন্ত মুখ দেখেনি। ওর কাছে ত সবই ভালো লাগবে।

কুমীর হচ্ছে সবচেয়ে বোকা জানোয়ার। গরু, ঘোড়া, এমন কি গাধাকেও খেলা শেখাতে পারে সার্কাসওলা; কিন্তু কুমীরের বেলায় একথা খাটেনা। কুমীরের মাথাটা এত বড় দেখতে হলে কি হবে, তার মগজে মানুষ আর কুকুর ত দূরের কথা, সামান্য একটা খরগোসের বুদ্ধিও নেই। একটা কুকুব হাজার রকমের কসরং শিখতে পারে, মানুষ পারে লাখ রকমের কিন্তু কুমীর একটাও পারে না।

এস্‌প্লেনডিডোর এই কুমীরগুলোর মধ্যে একটার কিন্তু মগজে বেশ বুদ্ধি ছিল। এস্‌প্লেনডিডোর চাকর পেড্রো যখন হাততালি দিয়ে তার নাম ধরে ডাকত, কুমীরটা পারের কাছে এসে মুখ বার করে ভেসে উঠত। তার নাম ছিল রোজা।

রোজা ছিল মাদী-কুমীর। সে আরও একটা কসরৎ শিখে ফেলল; খাবার ছুঁড়ে দিলে একটা মস্ত বড় হা করে লুফে নিতে পারত। ল্যাজে ভর দিয়ে দাঁড়াতেও সে শিখেছিল। পুরুষ-কুমীরটার নাম ছিল জোয়াও, পর্তুগিজ ভাষায় 'জনের' উচ্চারণ হচ্ছে ঐ নামটি। তার মাথায় কোনো বুদ্ধিই খেলত না, সে ছিল একেবারে নিরেট হাবা কুমীর। সারাদিন পারের ধারে কাদায় শুয়ে ভোঁস ভোঁস করে সে

ঘুমত। এক খাবার দেয়ার সময় সে একটু নড়ত চড়ত। ভয়ানক লোভী ছিল কি না কুমীরটা, তাই নিজের খাবার ত খেতই, আবার রোজার খাবারের উপরও ভাগ বসাত।

একদিন এস্‌প্লেনডিডো পেড্রোকে জিজ্ঞেস করল, "কি রে জীবজন্তুরা সব আছে কেমন ?"

পেড্রো মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, "আজ্ঞে সবাই ত বেশ ভালই আছে, শুধু পুরুষ আনাকোণ্ডা সাপটাকে নিয়ে হয়েছে বিপদ। ওর দু'টো দাঁত ভেঙে গেছে। তা আপনি ভাববেন না হুজুর, দু'দিনেই দাঁত উঠবে।"

"বেটা বোকা কোথাকার।" এস্‌প্লেনডিডো হেসে বলল, "বুড়ো হয়ে গেছে, ওর আবার দাঁত উঠবে কি!"

পেড্রো চুপ করে গেল। সে জানত তার মনিবের বড় দেমাক। আর একবার ওকথা বললে হয়ত লাথি মেরে তাকে বাড়ী থেকে বার করেই দেবে। এদিকে এস্‌প্লেনডিডো অনেক ভেবে এক মতলব ঠাওরাল। সে আনাকোণ্ডার দাঁত দু'টো সোণা দিয়ে বাঁধিয়ে দেবে। সে হবে এক দেখবার মত জিনিস! পৃথিবীতে সোণার চামচে, সোণার ঘড়ী, সোণার নুনদানী অনেক আছে, কিন্তু সাপের সোণা বাঁধানো দাঁতের কথা কেউ কখনও শোনে নি। তোমরা ভাবছ, ব্রেজিলের বনবাদাড়ে পড়ে থেকে এস্‌প্লেনডিডো পৃথিবীর খবর রাখবে কি করে ? মোটেই তা নয়, পৃথিবীর বড়লোকরা কেমন করে খায়, হাঁচে আর কাসে তাও এস্‌প্লেনডিডো জানত। ওর

কাছে থেকে খবর পাওয়া যেত যে; আরব দেশের কোন এক রাজার সাত বৌ-এর সাতটা সোণার নথ আছে, তার এক একটার ওজন আধসের। ভারতবর্ষের ভুপালের বেগমের একটা সোণার সেলাইয়ের কল আছে। সিপটির রাজা নোনোর আছে একটা সোণার পিকদানী—তোমরা ভাবছ, নোনোর নামটা আমি তোমাদের বানিয়ে বললুম। না, হিমালয় পর্বতে সিপটি বলে সত্যিই একটা জায়গা আছে, সেখানকার রাজার নাম নোনো। লোকের অমন বিদ্‌ঘুটে নাম থাকলে আমি কি করব বল? এস্‌প্লেনডিডো মনে মনে বলল, ওদের সবার উপরে এবার টেক্কা দেব। নথ, সেলায়ের কল আর পিকদানীর বড়াই ভেঙে যাবে। ও ত সোণা থাকলেই গড়ানো যায়, কিন্তু ওরা বাঁধিয়ে দিক ত সাপের দাঁত সোণা দিয়ে। হুঁ, সে বাবা সোজা কথা নয়!

মানাওসে ডাক্তার বদ্যি না থাক, ছিল এক দাঁতের ডাক্তার। যেখানে সোণা এত সস্তা, সেখানে নিশ্চয়ই সোণা দিয়ে দাঁত বাঁধাবার লোকও যথেষ্ট পাওয়া যাবে—এই ভেবে ডাক্তার এখানে এসে বসেছিলেন। তা পসারও হয়েছে খুব। ক'বছরে তিনি ছ'হাজার লোকের সোণা-বাঁধানো দাঁত তৈরী করে দিয়েছেন। এস্‌প্লেনডিডোর নিজেরই ত সব কটা দাঁত সোণা-বাঁধানো। সে যখন হা করত ঝকমক করে উঠত দাঁতগুলো। একজন হেসে বলেছিল, 'মুখ ত নয়, এ-যেন ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের মোহর রাখবার সিন্দুক, সেখানে পাউণ্ডের নোট

যত খুশি ভাঙিয়ে তুমি মোহর নিয়ে আসতে পারবে।' যেই বলুক, লোকটা কিন্তু বেশ রসিক।

আর একজনকে আমি জানতাম, তারও সব দাঁত ছিল সোণা-বাঁধানো। সে ছিল কানাডার এক স্টীমারের সারেঙ। তার স্টীমার ক্লোনডাইক দিয়ে রোজ চলাচল করত। এখন ক্লোনডাইকে খুব সোণা পাওয়া যায়। এত সস্তা যে, একখানা রুটি দিলে তুমি এক তাল সোণা ত পাবেই বেশিও পেতে পার। তার মানে হচ্ছে সোণার চাইতে সব জিনিসের দামই সেখানে বেশি। আমার সঙ্গে এই সারেঙটির দেখা হয়েছিল মেসোপটেমিয়ায়। সে ১৯১৫ সালের কথা। তুর্কিদের সঙ্গে ইংরেজদের ভীষণ যুদ্ধ বেধেছে। যুদ্ধের সময় ট্রাইগ্রিসের উপর দিয়ে যে-সব জাহাজ সৈন্য বোঝাই হয়ে আসত সে তারই একটা জাহাজ চালাত। আমিও যুদ্ধে গিয়েছিলাম কিনা তাই আমার সঙ্গে খুব আলাপও হয়েছিল লোকটার। যাক্‌গে ওসব, এখন ডাক্তারের কাছে গিয়ে ত শ্রীযুক্ত এস্‌প্লেনডিডো বলল, "তোমাকে আমার আনাকোণ্ডা সাপটার তু'টো দাঁত বাঁধিয়ে দিতে হবে।"

ডাক্তার ত শুনে অবাক। অনেকক্ষণ পরে বললেন, "দাঁত তুলতে গেলে ব্যথা খানিকটা পেতেই হবে। মানুষের দাঁত যখন আমি সাঁড়াশি দিয়ে তুলে ফেলি, তারা ব্যথাও পায়, কিন্তু কিছু বলেনা। কিন্তু সাপ কি আর চুপ করে ব্যথা সয়ে যাবে। না, মশাই পারবনা আমি!"

কিন্তু এস্‌প্লেনডিডো কি আর তাঁর কথা শোনে! সে বলল, ডাক্তার কাজটা করে দিলে তাকে পাঁচশ' মোহর দেবে। ডাক্তার রাজী হলেন। এস্‌প্লেনডিডোর মোটর-বোটে চেপে তিনি একদিন গিয়ে সাপটাকে দেখে এলেন, কিরকম সাপের দাত হবে, না দেখলে বুঝবেন কি করে। ডাক্তার রাজী হলেন এক সর্তে। সাপটাকে দাঁত পরাবার সময় এমন ভাবে ধরে রাখতে হবে, সে যেন নড়তে-চড়তে না পারে। এস্‌প্লেনডিডো পেড্রোকে হুকুম দিল সেই ব্যবস্থা করতে।

পুরুষ আনাকোণ্ডাটার নাম ছিল জ্যাসিন্তো, লম্বায় সে হবে পুরো আঠারো হাত। পেড্রো একটা বুদ্ধি ঠাওরাল। সে একটা আঠারো হাত লম্বা লোহার পাইপ যোগার করে ফেলল। সেই নলের একদিকে একটা প্রকাণ্ড বেশ শক্ত দড়ি দিয়ে ফাঁস তৈরী করে রাখা হল। তার মুখটা খোলা রইল। কিন্তু যে কোনো সময়েই দড়ি ধরে টানলেই মুখটা বন্ধ করা যেতে পারে। আর একটা দিক রইল একেবারে খোলা।

জ্যাসিন্তো থাকত একটা দেয়াল ঘেরা ছোট্ট নালার ভেতরে। পেড্রো পাইপটাকে সেখানে টেনে নিয়ে দেয়াল ফুটো করে তার ভেতর দিয়ে পাইপের খোলা মুখটা ঢুকিয়ে দিল, তারপর একটা গিনিপিগ ছেড়ে দিল নালায়। ব্রেজিলে বিস্তর গিনিপিগ পাওয়া যায়। সেখানে কেউ তাদের খোঁয়াড়ে ধরে রেখে পোষেনা। শুধু মাঝে মাঝে শিকারীরা

ফাঁদ পেতে হাজার হাজার গিনিপিগ ধরে দেশবিদেশে চালান দেয়। জ্যাসিন্তো এতক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে ছিল, গিনিপিগটা নালার মধ্যে যেতেই সে এবার সজাগ হল। তারপরেই হেলতে দুলতে এগোতে লাগল তার দিকে। সে বেচারা তখন ভয়ে এদিক ওদিক ছুটছে। কিন্তু কোথায় যাবে চার দিকে যে দেয়াল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল পাইপের মুখটা। সে আর দেরী না করে তার ভেতরে ঢুকে পড়ল! এদিকে জ্যাসিন্তোও পেছনে পেছনে তাকে তাড়া করল। প্রাণের ভয়ে গিনিপিগটা এত জোরে ছুটছিল যে, এক নিমিষের মধ্যে সে পাইপের ভেতর থেকে বেরিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে গেল। জ্যাসিন্তো ত আর অত জোরে চলতে পারে না। সে বেশ ভূঁড়ি দোলাতে দোলাতে এগিয়ে এসে পাইপের আর এক দিকে মুখ বার করে দেখল, গিনিপিগটা ছুটছে। কিন্তু অতবড় লম্বা শরীর নিয়ে ত সুড়ৎকরে বেড়িয়ে আসা যায় না! এদিকে পেড্রো ফাঁসের মুখের দড়ি ধরে টানতেই তার গলায় আটকে গেল ফাঁসটা। এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা ঘটে গেল, যে জ্যাসিন্তো একটু টানা হেঁচড়া করবারও সময় পেল না। পাইপটা জন চারেক লোক ধরে তুলে ফেলল। তারপর দেয়ালের ফুটোটা চুন সুড়কি দিয়ে ওরা বুজিয়ে দিল।

ছবিতে তোমরা দেখছ ত, চার জন লোক পাইপটা কত কষ্টে টেনে তুলেছে। জ্যাসিন্তো গলায় দড়ি পরে কেমন ফোঁস ফোঁস করছে। অবশ্যি, ছবি যিনি এঁকেছেন তিনি ফোঁস

ফোঁসানি ত আর ছবিতে আঁকতে পারেননি। তোমরাও তাই দেখতে পেলে না জ্যাসিন্তোর রাগ। সমুখে পাইপের মুখটা যে ধরে আছে সে হচ্ছে পেড্রো। আর দূরে দু'জনকে দেখছ ত? ঐ যে ছাতা মাথায় যিনি উনি হচ্ছেন এস্‌প্লেনডিডোর স্ত্রী, আর চুরুট মুখে হচ্ছে এস্‌প্লেনডিডো নিজে। ওঁরা খুব হাসছেন জ্যাসিন্তোর দুর্দশা দেখে।

জ্যাসিন্তোকে মোটর-বোটে চাপিয়ে এবার ওরা নিয়ে গেল দাঁতের ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার একটু ভয় পেয়েছিলেন বই কি। দুধের সঙ্গে চার ফোঁটা ব্রাণ্ডি খেয়ে তবে তিনি টেবিলের উপর শোয়ানো নলটার কাছে এলেন। এখন একটা মুস্কিল হল। জ্যাসিন্তো যে মুখ খোলে না। ডাক্তার দাঁত পরাবেন কেমন করে? পেড্রো আবার একটা গিনিপিগ এনে জ্যাসিন্তোর মুখের সামনে ধরল। বেচারার পেট খিদেয় চো চো করছিল। গিনিপিগটাকে দেখে মুখ না খুলে আর করে কি? কিন্তু কোথায় গিনিপিগ? ওর মস্ত বড় হা-র মধ্যে পেড্রো একটা লাঠি পুরে দিল। সে লাঠিটা গিলতে পারে না, মুখও বুজতে পারে না।

এবার ডাক্তার কাজ শুরু করলেন। জ্যাসিন্তো ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। সে কি ভীষণ ফোঁস ফোঁসানি। মনে হল, বিরাট এক ইঞ্জিন যেন ষ্টেশনে অনেকক্ষন থেকে দাঁড়িয়ে আছে, ড্রাইভার এসে কিছুটা বাষ্প বার করে না দিলে, এখুনি বয়লার ফেটে একটা কাণ্ডই হবে।

দু'টো দাঁত পরিয়ে দেয়া হলে এবার জ্যাসিন্তোকে নিয়ে তার নালায় ছেড়ে দেয়া হল। দলে দলে লোক এল তার সোণা বাঁধানো দাঁত দেখতে। এস্প্লেনডিডো ত অহঙ্কারে ফেটে পড়েন আর কি! আছে এমন সোণা বাঁধানো দাঁত কারো সাপের? ওঃ, কারো আছে সোণার নুনদানী; কারো আছে নথ, বালা—কিন্তু সে সবার সেরা লোক। তার আছে এমন একটা সাপ, যার দাঁত সোণা বাঁধানো।

কিন্তু জ্যাসিন্তোটা কি নেমক হারাম! অমন সোণা বাঁধানো দাঁত নিয়েও তার সুখ নেই। তা ওদের আর দোষ কি? সোণার দাম ত আর ওরা জানে না। ওদের কাছে সোণার থেকে এক টুকরো মাংসের দাম অনেক বেশি। সময় সময় মনে হয়, এদিক দিয়ে ওরা কিন্তু মানুষের চাইতে বুদ্ধিমান। মানুষ সোণার লোভে কত কষ্ট সহ্য করে। এমন কি অষ্ট্রেলিয়ায় সোণার খনির খোঁজে গিয়ে কত লোক সিংহের হাতে প্রাণ দিয়েছে। অথচ এত কষ্ট সহ্য করে কি ফল হয় বল ত? লোহা, চকোলেট বা রবারের থেকে ওর দাম কি বেশি! আর দেখতেও বা এমন কি সুন্দর! একটা ফুল, একখানা ছবি, বা একটা কাচের ঝাড়ের থেকে নিশ্চয়ই সুন্দর নয়। তোমরা একটু ভেবে দেখত, কেন মানুষ সোণা সোণা করে পাগল হয়!

একদিন এস্প্লেনডিডো এসে দেখল, জ্যাসিন্তোর একটা সোণার দাঁত নেই, তার জায়গায় আছে একটা ছোট্ট সাধারণ

দাঁত। সে মহা খাপ্পা হয়ে পেড্রোকে তেড়ে মারতে গেল, বললে, "বেটা চোর! সোণার দাঁত চুরি করে তুই এমনি একটা বাজে দাঁত সেখানে বসিয়ে দিয়েছিস! তোকে আমি জেলে দিতে পারি জানিস।"

এখন ব্যাপারটা হল কি জানো? সাপের দাঁত আর মানুষের দাঁত এক নয়। মানুষের প্রথম দাঁত পড়ে যায় বারো বছর বয়সে, তার পরে আবার দাঁত গজায়। কিন্তু বুড়ো বয়সে সেই দাঁতগুলো যখন একে একে পড়ে যায়, তখন আর গজায় না। তখন বাধ্য হয়ে তাকে বাঁধানো কোন দাঁত পরতে হয়! অবশ্য, এর মধ্যে কারো কারো বুড়ো বয়সেও আবার দাঁত উঠতে দেখা যায়। এই ত আমারই এক দিদিমার নব্বুই বছর বয়সে দু-তিনটে খুদে খুদে দাঁত উঠেছে। কিন্তু এ ভাগ্য আর ক'টা লোকের হয়, সাপ বা কুমীর ওদের দাঁত বার বার পড়ে, আবার ওঠে। পেড্রো একথা জানত, রোজার পড়ে যাওয়া দাঁতগুলো দিয়ে স্ত্রীকে একছড়া মালা সে তৈরী করে দিয়েছিল। তাই সোণা বাঁধানো দাঁত পড়ে যেতে ও অবাক হয়নি। সে শুধু ভাবছিল, একদিন নালায় নেমে কি করে দাঁতটা তুলে আনা যায়। এদিকে সাপটা আবার যা রেগে আছে তার উপর!

মনিব লাঠি নিয়ে তাড়া করে আসতেই ও তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে হাততালি দিয়ে ডাকল: "রোজা, রোজা!"

রোজা ওর ডাক শুনে পুকুরের পারের কাছে এসে ভুস্ করে মাথা তুলল। এদিকে এস্‌প্লেনডিডোও লাঠি হাতে তার

পেছনে পেছনে এসে হাজির। পেড্রো তাকে দেখেই জলে নেমে রোজার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু রোজা তখন ভীষণ রেগে গেছে। কি, তার বন্ধুকে মারতে এসেছে লোকটা। আগেই বলেছি কুমীরের জাতের মধ্যে ওর মত চালাক আর দু'টি ছিল না। সে ত রেগে গিয়ে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। এ কিন্তু সাপের ফোঁস ফোঁসানি নয়, কুমীরের নাক ডাকানো বরং বলতে পারো। চিড়িয়া খানায় যদি কুমীরদের পুকুরের পাহারাওয়ালার সঙ্গে তোমাদের ভাব থাকে, তাহলে একবার শুনে আসতে পার সেই নাক ডাকানোর শব্দ। তোমাদের কিছুই করতে হবে না, পুকুরের রেলিঙের উপর ঝুঁকে পড়ে লম্বা লাঠি দিয়ে একটা কুমীরের পেটে একটু খোঁচা মেরে দেখ ত? কিন্তু আমি তোমাদের বারণ করে দিচ্ছি, ও-সব করতে যেও না। রেলিঙটা যদি নড়বড়ে হয়, পড়ে গিয়ে একটা বিপদ ঘটাবে। আর তা না হলেও আর একটা বিপদ আছে। অন্য একটা পাহারাওয়ালা এসে ঘাড় ধরে চিড়িয়াখানা থেকে বার করে দিতে পারে ত? হয়ত কোনোদিন আর সেখানে ঢুকতেই দেবে না। আশা করি, তোমরা তা চাও না।

এখন রোজার কথাই বলি, কি বল? চিড়িয়াখানায় যত কুমীর দেখেছ, তার চেয়ে ডবল লম্বা আর মোটা ছিল রোজা। কুড়ি ফুট ত সে লম্বাই হবে। আর পাশে? তাও প্রকাণ্ড একটা পিপের মত মোটা বলতে পার। এখন ভেবে দেখ,

বেয়াদব চাকরকে শাস্তি না দিলে—পৃঃ ৩৩

এই আমার চাকর অলিভার—পৃঃ ৩৯

তার হা-টা কতখানি! সেই হা নিয়ে যদি অমন করে নাক ডাকায়, কার না ভয় করে। এস্প্লেনডিডোও খুব ভয় পেল। তবু মনিব মানুষ, বেয়াদব চাকরকে শাস্তি না দিলে কি তার মান থাকে? সে লম্বা লাঠিটা নিয়ে ছুঁড়ে মারলে পেড্রোর দিকে। কিন্তু এত জোরে মারলে যে, টান সামলাতে না পেরে নিজেই ঝুপ করে পড়ে গেল পুকুরে।

জোয়াও কখন এসে রোজার পাশে চুপটি করে বসেছিল কেউ জানতে পারে নি। সে ভেবেছিল, এখন বুঝি খাবার দেবার সময়। এস্প্লেনডিডো পড়ে যেতেই সে তাঁকে মুখে তুলে নিল। এত তাড়াতাড়ি সে তাকে সাবাড় করলো যে, এস্প্লেনডিডোর মুখের জ্বলন্ত চুরুটটা পর্যন্ত সে গিলে ফেলল। তারপর জিভ পুড়ে এক কাণ্ড! যারা গরম জিনিস জুড়োতে না দিয়ে খায় তারা ত তার ফল পাবেই। কিন্তু সবটা সে খেল না, একখানা ঠ্যাং রেখে দিল রোজার জন্য। নইলে রোজার ল্যাজের বাড়ি খেতে খেতে মরে যাবে না! এস্প্লেনডিডোর সোণার ঘড়ীটা কত দিন জোয়াওএর পেটের মধ্যে টিক্ টিক্ করে চলেছিল কে জানে! আমি ত আর যাদুকর নই যে, ঐ কুমীরভরা পুকুরে নেমে জোয়াওর পেটে কান পেতে শুনে আসব ঘড়ীর শব্দ। পেড্রো? পেড্রোর সঙ্গে রোজার খুব ভাবছিল বটে, কিন্তু অন্য কুমীরগুলো কি আর তাকে ছেড়ে কথা কইবে?

পেড্রোকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল থানায়। আদালতে তার বিচার হল। জজ সাহেব কিন্তু সব কথা শুনে বললেন, "এস্‌প্লেনডিডো যেমন কাজ করেছে, তার ফলও পেয়েছে। তোমার কোনো দোষ নেই, তোমাকে আমি ছেড়ে দিলাম।"

এক সপ্তাহ পরে এস্‌প্লেনডিডোর স্ত্রীর কাছ থেকে রোজাকে কিনে নিল এক মার্কিণ সার্কাসওলা। নাম তার ফিস। পেড্রোকেও সে মাইনে করে রাখল, রোজাকে নানা কসরৎ শেখাবার জন্য। এখন তারা দেশবিদেশে সার্কাসের দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। রোজা এখন খুব সৌখীন বাবুর মত পাইপে করে তামাক টানতে পারে, লেজ দিয়ে বাজাতে পারে পিয়ানো। পেড্রো এসব ওকে শিখিয়েছে বলে তারও খুব নাম। একশ'টা মেডেল তার গলায়। তার উপর মাইনেও পাচ্ছে মোটা। ঐ সার্কাসের দলটা যদি কখনও এখানে আসে, তোমরা দেখতে ভুলো না কিন্তু।

আমার বন্ধু লিকি

খাওয়ার কথা বলছ ?

আমি আমার জীবনে নানা ধরণের লোকের সঙ্গে বসে খেয়েছি। একবার এক কয়লার খনির মজুরদের সঙ্গে কয়লার খাদের মধ্যে বসে খেয়েছিলাম। মস্কৌতে সেবার খেলাম সোভিয়েটের হোমরা-চোমরা লোকদের সঙ্গে। কত রকমের খাবার এল, নামই জানি না। তারপর কোটিপতির সঙ্গে খাওয়ার সৌভাগ্যও হয়েছে। কিন্তু ওসব গল্প ত তোমরা পছন্দ করবে না। তাই একজন যাদুকরের সঙ্গে খাওয়ার গল্প আজ তোমাদের বলছি। যাদুকর বলতে তোমরা যদি ধরে নাও কালো পর্দা খাটিয়ে তোমাদের স্কুলে যারা ম্যাজিক দেখায় তাদের, তাহলে আমি নাচার। আমি ওসব লোকের গল্প করব না। ওরা যাদুবিদ্যার জানে কি ! বড় জোর একটা লোককে ঘুম পাড়িয়ে তাকে নাচাতে পারে বা কাঁদাতে পারে। ওত তোমরাও পার, ও আর এমন শক্ত কি ! কিন্তু আসল যাদুকররা ত আর তেমন নয়। তারা কালো পর্দা খাটিয়ে খেলা দেখায় না। ইচ্ছে করলে তারা একটা কালো গরুকে ঘড়ি বানিয়ে ফেলতে পারে। হাত সাফাই ত নয়, লোকগুলো তখন প্যাট্‌ প্যাট্‌ করে চোখ মেলে চেয়ে রয়েছে।

তাহলে বুঝে দেখ, কত শক্ত কাজ এই যাদুবিদ্যা শেখা। পুরণো কালে মিশরে এই বিদ্যা শেখবার স্কুল ছিল। এখন আর নেই, থাকলে তোমাদের খবর দিতাম।

লিকির সঙ্গে যখন পরিচয় হয় আমি ভাবতেই পারিনি যে, সে একজন যাদুকর। একদিন বিকেল পাঁচটায় লণ্ডনের হে মার্কেটের পথ দিয়ে আসছিলাম। পথে ভয়ানক ভিড়। সব আফিস ছুটি হয়েছে। রাস্তা পার হতে গিয়ে মাঝ পথে থেমে পড়লাম। একটা বাস ছুটে আসছে। আমার আগে আগে একটা লোক চলছিল, সে কিন্তু থামল না, এগিয়েই চলল। তখন বাস প্রায় তার ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে। তাড়াতাড়ি তার ওভারকোটের কলার ধরে তাকে টেনে রাখলাম। এদিকে ড্রাইভারও তখন ব্রেক কষে বাস থামিয়েছে।

লোকটা খুব ভয় পেয়ে কাঁপছিল। তাকে হাত ধরে বাড়ী পৌঁছে দিলাম। সে খুব ধন্যবাদ দিয়ে আমাকে বলল, আসছে বুধবার তার বাড়ীতে আমার নিমন্ত্রণ রইল। আমি কিন্তু লোকটার মধ্যে অসাধারণ কিছু দেখতে পাই নি। শুধু তার কান দুটো একটু বড়, তার উপর চুল গজিয়েছে ক'গাছা। তোমরা শামুকের দাড়ি দেখেছ ত, তেমনি আর কি! আমার মনে হল, আমি হলে চুল কগাছা কামিয়ে ফেলতাম। কানে যদি অমন বড় বড় চুল গজায়, বিরক্তি লাগে না! সে তার নাম বলল, লিকি। সে থাকে বাড়ীটার দোতালায় একটা ফ্ল্যাটে।

বুধবার এসে গেল। তার ফ্ল্যাটে এসে ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। ঢুকে পড়লাম। অমন অদ্ভুত ঘর জীবনে দেখিনি। চারদিকের দেয়ালে রঙ বেরঙের পর্দা ঝুলছে। তার উপর রেশমী সূতোয় বোনা নানা জাতির মানুষ আর জীবজন্তুর ছবি। আমি একটা মানুষের ছবির উপর হাত বুলিয়ে দেখলাম, ওগুলো বোনাই বটে। কিন্তু আশ্চর্য! হাত দিতেই সেই ছবিটা বদলে গেল, সেখানে দেখা দিল একটা ভালুক। ভাল করে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, ঢুকে যে-সব ছবি দেখেছিলাম, তার একটাও নেই। নতুন ছবি সব ঝলমল করছে।

আসবাবপত্রগুলো পর্যন্ত অদ্ভুত। একটা কাচ দেয়া বইয়ের তাক, তাতে একখানা বই রয়েছে। কিন্তু ঐ এক-খানাই একশ'। একশ' বললে বোধহয় ভুল হয়, বলা উচিত পাঁচশ'। অত প্রকাণ্ড বই বোধহয় দুনিয়াতে আর দু'খানা মিলবে না। চেয়ার আছে কয়েকখানা, দু'টো টেবিল। একটা টেবিল তামার তৈরী। তার উপর একটা গোল স্ফটিক বসানো। আর একটা কাঠের, ধারে ধারে তার খাঁজ কাটা। ছাদের সঙ্গে ঝুলছে নানা অদ্ভূত জিনিস। প্রথমে ত ভেবেই পেলাম না, ঘরে আলো আসে কোথা থেকে। অনেক খুঁজেপেতে শেষে বার করলাম, টবে টবে কয়েকটা অদ্ভুত গাছে টোমাটোর মত ফল ধরে আছে, তার ভেতর থেকেই আলো বেরোয়। বাঃ! একটা ফল টিপে দেখলাম।

না, এত কাঁচের বালব্ নয়, ফলের মতই নরম ত!.. আর ঠাণ্ডা।

লিকি এবার বললেন, "কি খাবেন বলুন ত?"

"আপনি যা খাওয়াবেন।" আমি উত্তর দিলাম।

"আপনার যা খুসি তাই-ই খেতে পারেন, বলুন কি স্যুপ চাই?"

ভাবলাম, খাবার বোধহয় রেস্তরাঁ থেকেই আসবে। তাই একটা রুশ স্যুপের নাম বললাম।

"বেশ!" লিকি বললেন, "আমি এখুনি তৈরী করে দিচ্ছি। আচ্ছা, আমাকে যেমন করে খাবার পরিবেষণ করা হয়, তেমনি আপনাকেও করলে আপনি ভয় পাবেন না ত?"

"ভয়!" হেসে বল্লাম, "কি যে বলেন! ভয় আমি সহজে পাই না।"

"আচ্ছা, তাহলে আমার চাকরকে ডাকি। কিন্তু দোহাই আপনার তাকে দেখে ঘাবড়ে যাবেন না।"

লিকি এবার সেই বড় কান দু'টি নেড়ে হাততালির মত একটা অদ্ভূত শব্দ করলেন, তাই বলে অত জোরাল নয়। একটা প্রকাণ্ড তামার ঘড়া কাছেই বসানো ছিল, তার মধ্যে থেকে একটা শব্দ উঠল। দেখতে দেখতে কি একটা বেরিয়ে এল। প্রথমে ত সাপই ভেবেছিলাম, তারপর ভাল করে চেয়ে দেখি, সাপ নয়, রীতিমত এক অক্টোপাস। তার লম্বা হাতগুলো নড়ছে। একটা হাত দিয়ে সে একটা টানা খুলে

ফেলে বার করল তোয়ালে, তার হাত আর গা মুছে নিল। একেবারে খটখটে শুকনো শরীর। একটু ভয় যে না করছিল তা নয়, এতবড় অক্টোপাস আমি আর কোথাও দেখিনি! ওর প্রত্যেকটা হাত—হাঁ, হাতই বলব, লম্বায় আট ফুট। এক একটা হাত দিয়ে ছুরি কাঁটা প্লেট সব নামিয়ে এক নিমিষে টেবিল সাজিয়ে দিল।

"এ-ই আমার চাকর অলিভার।" লিকি বললেন, "একটা মানুষ দু'খানা হাত দিয়ে আর কটা কাজ করতে পারে বলুন? ওর হাত আছে আট'খানা। ও একাই ত আটজন লোকের কাজ করতে পারে। সেদিক দিয়ে ওকে চাকর রেখে আমি ঠকিনি।"

টেবিল সাজানো হয়ে গেলে আমরা এসে টেবিলে বসলাম। লিকি বললেন, "এবার সেই রুশদেশের সুপ চাই!" এই বলে মাথার লম্বা টুপিটার ভেতর থেকে দু'প্লেট সুপ বার করলেন।

"হাঁ, শুধু সুপ হলে ত হবে না, কিছু ক্ষীরও দরকার। ফিলিস, ফিলিস!"

দেখতে দেখতে খরগোসের মত ছোট্ট একটা সবজে রঙের গরু এসে টেবিলের উপর লাফিয়ে উঠল। অলিভার আগেই একটা রূপোর জাগ রেখে দিয়েছিল। লিকি তাতে দুধ দুইয়ে রাখলেন। তাকিয়ে দেখলাম, দুধ এত ঘন হয় না, একেবারে খাঁটি ক্ষীরে ভরে গেছে জাগটা। খেতেও কিন্তু খুবই ভাল লাগল।

স্যুপ খাওয়া হয়ে গেলে লিকি বললেন, "এবার কি আনতে বলব, বলুন ?"

"আপনার উপরে ছেড়ে দিয়েছি। আপনি যা হয় বলুন!" আমি বললাম।

"ভাজা টারবট মাছ আনতে বলি আর তারপর আসবে টার্কী—কি আপত্তি নেই ত? অলিভার, একটা টারবট মাছ ধরত। পম্পি ভাজবার জন্য তৈরী হয়ে থাক।"

অলিভার একটা বড়শি নিয়ে শূন্যে ফেলল। আমার এমন মজা লাগছিল! শূন্য থেকেই মাছ উঠবে নাকি। টারবট মাছ ত থাকে সমুদ্রে। কি জানি যা ব্যাপার দেখছি, উঠতেও পারে। এবার আগুন রাখার জায়গা থেকে বেরিয়ে এল পম্পি। ছোট্ট একটা ড্রাগন, এক ফুটের বেশি লম্বা হবে না, অবশ্য লেজ বাদ দিয়েই বলছি। এমনি ধারা ড্রাগনের ছবি তোমরা নিশ্চয়ই চীনে-উপকথায় দেখেছ। না দেখে থাক ত, ছবিতে দেখে নাও। এতক্ষণ গণগণে আগুণের মধ্যে শুয়েছিল বলে, তার সমস্ত শরীর একেবারে লাল হয়ে আছে। বেরিয়েই তাড়াতাড়ি সে পেছনের দু'খানা পায়ে এক জোড়া অ্যাসবেস্টসের বুট পরে নিল, অ্যাসবেস্টস আবার আগুনে পোড়ে না কিনা। তবু লিকি তাকে সাবধান করে দিলেন, "পম্পি, তোমার লেজটা সাবধানে রেখো। খবর্দার যেন কার্পেট পুড়ে না যায়। কার্পেট পুড়ে গেলে এক বালতি ঠাণ্ডা জল এনে ঢেলে দেব!"
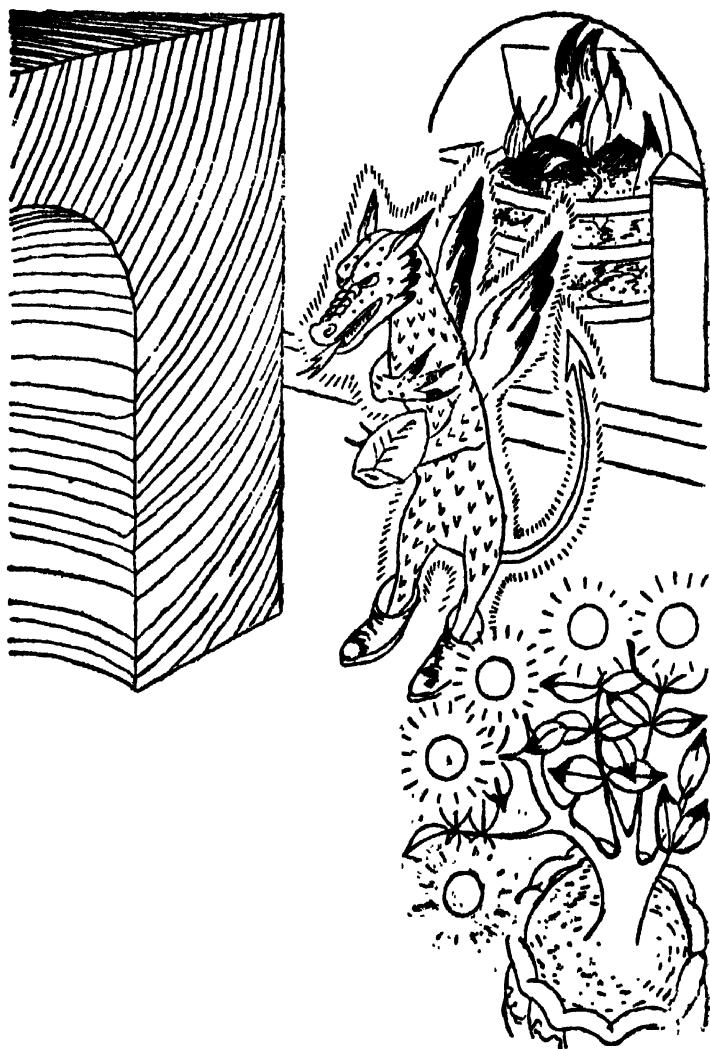
আগুন রাখার জায়গা থেকে বেরিয়ে এল পম্পি—পৃঃ ৪০

ছোট্ট চারটে চারাগাছ গজিয়ে উঠ্‌ল—পৃঃ ৪৭

পম্পি ভয় পেয়ে লেজ আর সামনের পা দু'টো তুলে ধরে কার্পেটের উপর চলতে লাগল। তোমরা হয়ত ভাবছ, ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলে কি আর হবে। কিন্তু ড্রাগন হচ্ছে এমন জানোয়ার, সব সময় তাকে গরম না রাখলে কোনদিন যে ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া হয়ে মারা যাবে তার ঠিক নেই। পম্পি আবার তার উপর একেবারে বাচ্চা।

পম্পিকে দেখতে এত ব্যস্ত ছিলাম, তাই অলিভারের মাছ ধরা আর দেখা হল না, তাকিয়ে দেখি মাছটার আঁস ছাড়িয়ে মস্‌লা মেখে সে পম্পির দিকে ছুঁড়ে দিল। পম্পির সামনের পা নিশ্চয়ই একটু জুড়িয়ে এসেছিল, সে সেই পা দিয়ে মাছটা চেপে ধরল। মাকে জিজ্ঞেস কোরো, গণগণে আঁচে মাছ ভাজা পুড়ে যায়, তাই নিবন্ত আগুনেই ভাজতে হয়। পম্পিকে লিকি এ-সব শিখিয়েছিলেন বলেই সে জুড়িয়ে আসা আঁচে ভেজে দিল মাছ। অলিভার এবার মাছটাকে তুলে প্লেটে রাখল। এদিকে পম্পি কাঁপতে শুরু করেছে। দাঁতে দাঁত লেগে গেছে ঠাণ্ডায়। সে আর একটু দেরী করলে হয়ত অজ্ঞান হয়েই পড়ত। লিকি তাকে হুকুম দিতেই সে আগুনের কুণ্ডের মধ্যে, সুড় সুড় করে ঢুকে পড়ল।

লিকি এবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি জানি, আগুনের কুণ্ড থেকে মাঝে মাঝে পম্পিকে বার হতে হয় বলে অনেকেই আমাকে দোষ দেয়। একজন বন্ধুও বলেছেন, এমনি করেই পম্পি একদিন নিউমোনিয়া হয়ে মারা যাবে।

কিন্তু এ শিক্ষাও ত ওকে দেয়া উচিত যে, জীবনটা শুধু আগুন পুইয়ে আরামে কাটিয়ে দেয়ার জন্য নয়। এখানে একটু দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হবে বইকি। রূপকথায় যে-সব ড্রাগনের কথা আপনি পড়েছেন, তারা বেশ আরামেই থাকত। মানুষ তাদের ভয় করে চলত। কিন্তু এখন ত আর সেদিন নেই। এই ত দেখুন, আমি একটা সামান্য যাদুকর, একটা ড্রাগনকে রাঁধুনি রেখেছি। অথচ ওরই ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা তার ঠাকুর্দার হাঁচির চোটে চীনের রাজবাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছিল। আর আমি কি করছি জানেন, ওর নিশ্বাস দিয়ে হয় আমার রান্না, ওর লেজ দিয়ে আমি লোহা গালাই। তারপর রাতে ও এখানে আছে বলে চোর ঢুকতে সাহস পায় না। ওর গায়ে গুলি করলে গুলি গলে জল হয়ে যাবে একথা চোরেরাও জানে। দেখুন ত, একটু মাথা খাটিয়ে আমি একটা জলজ্যান্ত ড্রাগন দিয়ে কত কাজ করিয়ে নিচ্ছি।”

আমি বললাম, “দেখুন, বলতে কি, আমি পম্পির আগে কখনও জীবন্ত ড্রাগনই দেখিনি। ছবি অবশ্য বহু দেখেছি।”

লিকি হেসে বললেন, “ও আপনি যে আবার যাদুবিদ্যা জানেন না একথা আমার মনে ছিল না। মাছটা যে জুড়িয়ে গেল, আসুন ওটার সদ্ব্যবহার করা যাক।” এই বলে তিনি টুপির ভেতর থেকে একরাশ টোমাটো সস্ বার করে প্লেটের উপর রাখলেন।

ঠিক এমনি সময় একটা নুনদানী পিঠে ঝুলিয়ে উড়তে উড়তে এল একটা প্রজাপতি; রামধনুরঙের তার পাখা। লিকি আবার বললেন, "আপনি এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমি একজন খাঁটি যাদুকর। হাতের কসরৎ দেখিয়ে যারা পয়সা নেয় আমি তাদের দলে নই। এখানে পম্পি হচ্ছে একমাত্র সত্যিকারের ড্রাগন, আর সবাইর ভোল বদলে দিয়েছি আমি। এই অলিভারের কথাই ধরুন না। ও যখন মানুষ ছিল, ওর পা দু'খানা রেলে কাটা যায়। আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। এখন, কলকারখানার কাছে আমার যাদুবিদ্যা খাটে না। তাই বলে একটা লোক মরছে, তাকে ফেলে চলে আসব! ওকে মন্ত্র পড়ে একটা শামুক বানিয়ে পকেটে নিয়ে বাড়ী ফিরলাম। বড় ভাবনায় পড়ে গেলাম, কোন জন্তুর রূপ ওকে দেয়া যায়? সবারই পা আছে, অথচ ওর পা দু'টোই কেটে গেছে। শেষে ভাবলাম, দিই অক্টোপাস করে। অক্টোপাসের একখানাও পা নেই, হাতগুলো সব মাথা থেকে বেরিয়েছে। এখন ও বেশ সুখেই আছে। ও আগে ছিল এক হোটেলের বয়, এখানেও সেই কাজই করছে। তবে আগের থেকে এখন অনেক সুবিধে। তখন ছিল দু'হাত; আর এখন আট'টা হাত। অলিভার, তোমার জন্যে কিছু মাছ আমরা রেখে দিলাম, তুমি খেও।"

এবার টার্কীর পালা। এবার কিন্তু আগের মত মজার

ব্যাপার কিছু ঘটল না। অলিভার একটা প্লেট এনে টেবিলে রাখল, তার উপর আর একটা প্লেট দিয়ে চাপা দিল। লিকি উঠে গিয়ে একটা ছোট্ট লাঠি নিয়ে এসে সেই প্লেটের উপর ছুঁইয়ে বিড় বিড় করে কি বললেন। ঢাকনাটা তুলে ফেলতেই দেখা গেল প্লেটের উপর একটা সেদ্ধ টার্কী পাখী, ধোঁয়া বেরুচ্ছে তার গা দিয়ে।

লিকি বললেন, "এটা মশাই অতি সোজা ব্যাপার। যে কোনো লোকই করতে পারে। তবে কথা কি জানেন, বাসি না টাটকা এ কথা হলফ করে বলা যায় না। তবু পাখী বলেই খাওয়া চলতে পারে, কিন্তু এমনি করে উড়িয়ে আনা মাছ আমি কখনো খাইনে। তাই রোজই অলিভারকে বড়শি দিয়ে মাছ ধরে আনতে হয়। টার্কী ত এল, এখন সসেজ্ না হলে হবে না।

এই বলে তিনি পকেট থেকে একটা নল বার করে তাতে ফুঁ দিলেন। দেখতে দেখতে নলের অন্য মুখ দিয়ে সসেজ্এর সবুজ পাতা বেরিয়ে এল! টুপি থেকে তিনি আবার খানিকটা সসেজ্ বার করে রাখলেন।

এবার একটা দুর্ঘটনা ঘটল। যে পোকাটা নুনদানী নিয়ে এসেছিল টেবিল ক্লথে বেঁধে সে পড়ে গেল। নুনও পড়ল অনেকখানি। লিকি তাকে ধমকে বললেন, "লিওপোল্ড, আমার কোন কুসংস্কার নেই বলে তুমি বেঁচে গেলে। অন্য কেউ হলে আর তোমাকে আজ আস্ত

রাখত না। নুন পড়লে শুনেছি সর্বনাশ হয়, কিন্তু আমার কিছুই হবে না! বরং তোমার সর্বনাশের দিন ঘনিয়ে আসছে। আমি আবার তোমাকে মানুষ করে থানায় পাঠিয়ে দেব।"

লিওপোল্ড বোধহয় একটু লজ্জিতই হল। সে অনেক কষ্টে নুনদানী বাঁধা ফিতেটা পিঠ থেকে খুলে ফেলল। এবার লেগে গেল নুন তুলতে। এক একটা করে নুনের দানা সে মুখে করে তুলতে লাগল।

লিকি আবার বলতে লাগলেন, "এই লিওপোল্ড যখন মানুষ ছিল, তখন বহুলোককে ঠকিয়ে সে করেছিল পয়সা। কিন্তু ক'দিন আর ঠকানো যায়। একদিন তার নামে হুলিয়া বেরুল। তখন আমার কাছে এসে কেঁদে পড়ল। জোচ্চোরকে কেন দয়া করব মশাই? তবু ওর কান্নাকাটিতে মন নরম হতে বললাম, আচ্ছা, ওরা তোমাকে সাত বছরের জন্য জেলে পুরে রাখত, আমি সেখানে পাঁচ বছরের জন্য পোকা করে রাখব। তুমি যদি বেশ শান্তশিষ্ট হয়ে পাঁচ বছর থাক, আমি তোমাকে আবার মানুষ করে দেব। মুখ এমন করে বদলে দেব যে পুলিশের সাধ্যি নেই ধরতে পারে। দেখুন, দেখুন, কেমন করে ও নুন তুলছে!"

চেয়ে দেখলাম, এবার আর মুখে করে লিওপোল্ড নুন তুলছে না। একটুকরো কাগজ যোগার করে এনে তাই দিয়ে তুলছে নুন, জাহাজের খালাসিরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কোদাল দিয়ে যেমন কয়লা তোলে, তেমনি করে কাগজ দিয়ে সে তুলছে।

"কি চালাক দেখছেন!" "লিকি হাসলেন, যখন মানুষ করে দেব, দেখবেন ও কেমন কাজের লোক হয়।"

এদিকে আমরা টার্কীটা প্রায় শেষ করে এনেছি, লিকি আমার সঙ্গে গল্প করছেন, খাচ্ছেনও বটে। কিন্তু তাকে কেন জানি একটু আনমনা বলে মনে হচ্ছে। তিনি খেতে খেতে মাঝে মাঝে উপরের কড়িকাঠের দিকে তাকাচ্ছিলেন। আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করেই বসলাম, "আপনাকে একটু আনমনা মনে হচ্ছে।"

"হবে না মশাই," লিকি বললেন, "আবহুল মক্কারকে সেই কখন ষ্ট্রবেরীর জন্য পাঠিয়েছি, এখনও এল না।"

"ষ্ট্রবেরী! এখন ত ষ্ট্রবেরীর সময় নয়!"

"আবহুল মক্কার হচ্ছে এক দৈত্য। তাকে ষ্ট্রবেরীর জন্য পাঠিয়েছি নিউজিল্যাণ্ডে। সেখানে এখন গাছে গাছে ষ্ট্রবেরী ফলে আছে। এখানে গ্রীষ্ম হলে কি হবে মশাই। সেখানে এখন জানুয়ারীর শীত। কিন্তু এখনও সে আসছে না কেন? এই সব জিনের ব্যাপার বোধ হয় আপনি জানেন না। এরা কোথাও গিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে চায় না। স্বর্গ অনেকদিন দেখেনি কিনা তাই ভাবে, যাই একবার স্বর্গের ওদিকটা ঘুরে আসি, দেখি দেবদূতরা কি বলে। এদিকে দেবদূতরা যে ওদের দেখতে পেলে তারা ছুঁড়ে মারবে সে খেয়াল নেই। যত তারা আকাশ থেকে খসে পড়ে সব হচ্ছে দেবদূতদের গুলি। ওই গুলি খেয়ে কত জিন যে একেবারে

অকেজো হয়ে গেছে তার ঠিক নেই। আবহুল এখুনি এসে পড়বে, আমরা ততক্ষণ চুপ করে বসে থাকি কেন? আসুন, ছু'একটা ফল চেখে দেখা যাক।"

লিকি এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। হাতের যাছ্-দণ্ডটা দিয়ে টেবিলের চার কোণায় চারবার ঘা মারলেন। দেখতে দেখতে কোনগুলো কেঁপে উঠে চির খেয়ে গেল। ছোট্ট চারটে চারা গাছ গজিয়ে উঠল, কচি কচি পাতা দেখা দিল, গাছ বড় হতে হতে এক ফুট হল, এবার ফল ধরল। তিনটে গাছের ফল আমি চিনতে পারলাম। একটা হচ্ছে চেরি, আর একটা পিচ আর ঐ যে কোণেরটা ওটা ডালিম। কিন্তু আর একটা গাছে যে ফল ধরল, তেমন ফল আমি কোথাও দেখি নি।

এবার আবহুল মক্কার এসে হাজির হল। দরজা দিয়ে সে এল না, দিব্যি ছাদ ফুটো করে সে এসে ঢুকল ঘরে! সঙ্গে সঙ্গে ছাদ আবার জোড়া লেগে গেল। আবহুল মক্কারের মুখের রং তামাটে, নাকটা মস্ত বড়, দেখতে কিন্তু ঠিক মানুষের মত। শুধু তার পেছনে অদ্ভূত এক জোড়া পাখা লাগানো, আর নখগুলো সব সোণার, তার পরনে সবুজ সিল্কের পাজামা আর লম্বা চাপকান, মাথায় ছিল একটা প্রকাণ্ড পাগড়ী।

এসেই সে মাটিতে নুয়ে পড়ে লিকিকে সেলাম জানিয়ে বলল, "হে ময়ুরের মত সুন্দর, পৃথিবীর পাপবিনাশকারী, আপনার আজ্ঞাবহ দাস নিয়ে এসেছে আপনারই প্রিয়

ফল। আপনি সেই ফল ভক্ষণ করে দাসকে কৃত কৃতার্থ করুন!"

অত-শক্ত কথা শুনে তোমরা ভাবছ, এ আবার কি রকম জিন, একেবারে ছাপার অক্ষরে কথা কয় যে! কিন্তু কি করবে বল? জিনেরা এখনও আমাদের মত সহজ করে কথা কইতে শেখে নি। তারা রূপকথার যুগের মানুষ, অমন জমকালো কথা না বললে তাদের মানাবে কেন? তোমরা আরব্য উপন্যাস পড়লেই বুঝতে পারবে আমার কথা সত্যি কিনা।

আবদুল মক্কার এবার আমার দিকে তাকাল, "হে মহানুভব, হে দৈত্যদানবের শাসক, আজ কোন কোন মায়াধর আপনার এই ভোজনশালাকে অলঙ্কৃত করেছেন, জানতে পারি কি?"

লিকি রেগে গেলেন, বললেন, "রে দাসানুদাস, আবদুল মক্কার! সেই মহানুভব ঋষি সোয়াইবের শাস্ত্রে লিখিত আছে যে কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই মিডিয়ানাইটসরা একদিন ফারাও-এর কুকুর হত্যা করেছিল। তার ফলও তারা ভোগ করেছিল।"

লিকির কথা শুনে আবদুল মক্কার মাথা নীচু করে রইল, তোমরা নিশ্চয়ই আমাকে জিজ্ঞেস করবে, মিডিয়ানাইটস কারা? এই ত মুস্কিলে ফেললে! মিডিয়ানাইটসদের কথা বলতে হলে এখন বাইবেল ঘাঁটিতে হবে। তাহলে আবার এক গল্প ফেঁদে বসতে হবে। আজ ওদের কথা থাক।

ফারাও এর পরিচয় শুধু তোমাদের দিচ্ছি। মিশরের রাজাকে বলা হত ফারাও। এখন হল ত ?

লিকি আবার বললেন, "তুমি এখন প্রস্থান করতে পার। কিন্তু নির্দ্ধারিত সময়ে আমার নিদ্রাভঙ্গ করে দিও। একটু অপেক্ষা কর, আমার ক্ষুরের ইস্পাতের ফলক (ব্লেড) আজ নেই, এবং লণ্ডন শহরের বিপণি আজ বন্ধ। কানাডার মন্‌ট্রিল নামক স্থান থেকে আমাকে এক ডজন ফলক অবিলম্বে সংগ্রহ করে দাও।"

"হে দীননাথ, আমি কম্পমান হয়ে বলছি, যথা আজ্ঞা।"

"কি হেতু কম্পমান ? হে জিন কুলের কুলাঙ্গার !"

"হে ইন্দ্রজাল সম্রাট ! বায়ুর নিম্নস্তর আজ বায়ুযানে পরিপূর্ণ, আর উচ্চস্তরে আছে তারকা আর চন্দ্র। দুই পথেই আজ পদে পদে সংঘর্ষের ভয়।"

"ভীত হোয়োনা। তোমার সংঘর্ষের ভয় নেই। আমার যাদুবিদ্যা তোমার পথের বিঘ্ন দূর করুক !"

আবদুল মক্কার আবার সেলাম জানিয়ে মেঝের তলায় মিলিয়ে গেল। টেবিলের দিকে এবার নজর পড়ল। তাকিয়ে দেখলাম, গাছের ফলগুলো বেশ বড় হয়েছে। চার নম্বরের গাছের ফলগুলোর রঙ একেবারে টুকটুকে লাল।

লিকি বললেন, "জিনের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই নি বলে আপনি কিছু মনে করবেন না। আলাপে বিপদ আছে। ধরুন আপনি লণ্ডন শহরের বিখ্যাত ক্রিকেট খেলার

মাঠ লর্ডস-এ ক্রিকেট খেলতে নেমেছেন, আপনার বিপক্ষে আছেন একজন খুব নাম করা বল ছোঁড়ার ওস্তাদ। হঠাৎ জিন এসে আপনাকে বলল, 'হে আমার প্রভু, আমি কি আপনার শত্রু ঐ দুর্দান্ত বলনিক্ষেপকারীকে হত্যা করব, অথবা ওকে এক বিকট পশুতে রূপান্তরিত করব?' কি করবেন বলুন ত? মশাই, আমি আগে ক্রিকেট খেলা দেখতে ভালবাসতুম, কিন্তু যাদুবিদ্যা শেখার পর থেকে আর যাই না। আর বছর কি মনে হল, ভাবলাম, যাই একবার অষ্ট্রেলিয়ান আর গ্লষ্টারের ম্যাচটা দেখে আসি। খেলা দেখতে দেখতে কেমন একটু গ্লষ্টারের দিকে মায়া পড়ে গেল। অমনি যাদুবলে অষ্ট্রেলিয়ার দলকে দিলাম হারিয়ে। এবার তাই আর যাব না ভেবেছি। কি জানি কোন একটা পচা দলের উপর আবার মায়া পড়ে যায়!"

এবার নিউজিল্যাণ্ডের ষ্ট্রবেরী আমাদের পাতে পড়ল। ষ্ট্রবেরী ক্ষীর দিয়ে খেতে যা লাগল, চমৎকার! গাছ থেকে অলিভার পীচ, ডালিম, এপ্রিকট, আর সেই অদ্ভুত ফলগুলো পেড়ে ডিসে রাখল। লিকি আমাকে বললেন, "ওগুলো হচ্ছে আম, ভারতবর্ষে জন্মায়। ইংলণ্ডে, যাদু না জানলে আম পাওয়া বড় শক্ত!"

"এইখানেই," লিকি বেশ গর্ব করে বললেন, "আমি লর্ড আর ডিউকদের থেকে বাহাদুর। আম তারা উড়ো জাহাজে বাক্স-বন্দী করে বিলেতে আনান, তার কি আর সে গন্ধ,

সে স্বাদ থাকে? আর আমি আম খাই, তাজা, টাটকা, গাছ থেকে সদ্য ছেঁড়া আম। শুধু ভারতের লোকেরাই এ জিনিস খেতে পারে। না, না, অমনি করে আম খাওয়া যায় না। ওই এক কামড়েই আপনার ইস্ত্রী করা সার্টের যা দশা হত সে আর বলবার নয়, ভাগ্যিস দাঁত ভাল করে বসে নি। আমের এই খোসাটা ছাড়িয়ে ফেললে এর নীচে পাওয়া যাবে রসে ভরা ফল, খেতে গেলেই টুপ টাপ করে রস গড়িয়ে পড়বে! এই জন্যেই আম খেতে হলে স্নানের ঘরে গিয়েই খাওয়া উচিত। আপনি নিশ্চয়ই কড়া ইস্ত্রী করা সার্ট পরেন না?"

"কেন বলুন ত?"

"ও-বিষয়ে একটা অদ্ভুত গল্প আছে। সে আজ একশ' বছর আগেকার কথা। মেক্সিকো থেকে একজন যাতুকর এসেছিলেন ইওরোপে। তাঁর নাম লুইজটো-পাকোটল্। এখানে এসে বড়লোকদের পয়সা ওড়ানো দেখে তাঁর ভাল লাগল না। ওরা গরীব-দুঃখীকে না দিয়ে অমন করে পয়সা ফুঁকে দেয় দেখে তিনি চটে গেলেন। তিনি ঠিক করলেন ওদের সব কচ্ছপ বানিয়ে দেবেন। এখন এই কচ্ছপ বানানোর মন্ত্রটা দুজনে মিলে একসঙ্গে পড়তে হয়, একজনের একটু দেরি হলে কিন্তু কোনো ফলই হবে না। ভদ্রলোক ভাবলেন, দুজন মানুষ যদি একসঙ্গে পড়ে, তাহলেও দেখা যাবে যে, একজন আর একজনের

থেকে অন্তত এক সেকেণ্ড পেছিয়ে ত পড়ছেই, তার বেশিও অবশ্য পড়তে পারে। তাই তিনি তার এক ইংরেজ যাদুকর বন্ধুর কাছে চাইতে এলেন তার দু'মুখো তোতা পাখী। তোতা পাখী ত আর বই দেখে পড়ে না, তাকে শিখিয়ে দিলে দম-দেয়া গ্রামোফোনের মত সে বলে যাবে একটুও থামবে না। এখন ইংরেজ যাদুকর বন্ধুকে অনেক বোঝালেন। তারপর ঠিক হল, একশ' বছর ধরে ইউরোপের বড়লোকরা কচ্ছপের খোলার মত শক্ত পোষাক পরবে এমনি ধারা একটা ব্যবস্থা করা হোক। এতে মেক্সিকোর যাদুকরেরও মান বাঁচে, আবার এদিকে বড়লোকেরাও বেঁচে যায়। ওঁরা মন্ত্র পড়ে একশ' বছরের মধ্যে যতগুলো সার্ট তৈরী হয়েছিল বা হবে সবগুলোকে কচ্ছপের খোলার মত শক্ত করে দিলেন। একশ' বছরের শাপ প্রায় কেটে এসেছে, দেখছেন না, কড়া ইস্ত্রী করা সার্ট এখন খুব কম লোকেই পরে।" আমার প্লেটের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ও, আমটা বুঝি এখনও কায়দায় আনতে পারছেন না। দাঁড়ান, মন্ত্র পড়ে রস ঝরা বন্ধ করে দিচ্ছি।"

আমের উপর যাদুদণ্ড ছুঁয়ে দিলেন লিকি। আম খেলাম, একটুও রস গড়িয়ে পড়ল না। চমৎকার খেতে! ষ্ট্রবেরী কোথায় লাগে। তার স্বাদের বর্ণনা করতে আমি পারব না, গ্রীষ্মের দিনে দেবদারু বনের ভেতর দিয়ে হাঁটলে এমনি গন্ধ পাওয়া যায়। আমের ভেতরে থাকে আঁটি, ওটা কিন্তু

টেবিল জুড়ে কচি কচি ঘাস—পৃঃ ৫৩

মাথার কাছে কি যেন ঝুলছে—পৃঃ ৫৬

গিলে ফেলা যায় না, তোমার গলায় বিঁধে যাবে। সে আঁটির উপরে থাকে হলদে রসে ভরা শাঁস। আমি লিকির মন্ত্র পরীক্ষা করবার জন্য খানিকটা রস আমার কোটের উপর ফেললাম। কি ব্যাপার হল জানো, রস কোট থেকে লাফ মেরে আমার মুখের ভেতরে এসে পড়ল। লিকি পাঁচটা আম আমাকে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য দিলেন।

এবার এল কফির পালা। টুপির ভেতর থেকে কফি বেরুল। কুকুর সম্বন্ধে নানা গল্প চলতে লাগল। হঠাৎ লিকির মনে পড়ল, ফিলিসের এখনও খাওয়া হয় নি। তিনি যাদুদণ্ডটা টেবিলের উপর আবার ছুঁইয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে টেবিল জুড়ে কচি কচি ঘাস গজাল। ফিলিস তার গোয়ালঘর থেকে ছুটে এল। আমাদের কফি খাওয়া শেষ হতে হতে ঘাস সব সাবাড়।

এবার লিকি বললেন, "চলুন, আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি। যখনই সময় পাবেন, আসবেন কিন্তু। বিকেলের দিকে এলে আমরা এক একদিন ভারতবর্ষ, জাভা, কি পোপোকাটাপেটেল থেকে ঘুরে আসতেও পারি। বেড়ানোটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। এবার আসুন ত গাল্‌চে-টার উপর। চোখ বুজুন, আপনি আবার নতুন লোক কিনা, মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারেন।"

একটা ছোট্ট গাল্‌চে মেঝেয় পাতা ছিল, তার উপরে গিয়ে

দাঁড়ালাম, লিকি আমার পাশে। চোখ বোজবার আগে টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ফিলিস ঘাস খেয়ে শুয়ে শুয়ে এবার জাবর কাটছে। লিকি আবার তাড়া লাগালেন। চোখ বুজলাম, শুনলাম লিকি গাল্‌চেটাকে আমার ঠিকানা বলে দিচ্ছেন। এ-যেন ট্যাক্সিতে চেপে ড্রাইভারকে বলা হল, তিন নম্বর ক্লাপহাম কমন্স। হঠাৎ মাথাটা কেমন ভারী ভারী লাগল, ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল মুখের উপর দিয়ে। কিন্তু সে এক সেকেণ্ডের জন্য। আবার মাথাটা হালকা হয়ে এসেছে, ঠাণ্ডা হাওয়া কোথায় উবে গেছে। কিন্তু চোখ এখনো বুজে আছি। লিকির স্বর শুনতে পেলাম, "এবার চোখ খুলুন, দেখুন কোথায় এসেছেন!"

তাকিয়ে দেখি, এযে আমারই বসবার ঘর। গাল্‌চেখানা কিন্তু এখনও একেবারে মেঝেয় নামে নি, একফুট উপরে শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে। তা নামবেই বা কোথায় বল। এখানে ওখানে বই খাতা ছড়ানো রয়েছে, একটু জায়গাও নেই। ভাগ্যিস্‌ গাল্‌চেটা বেশ মজবুত ছিল, তাই ঐ একফুট উঁচু থেকে লাফিয়ে মেঝেয় পড়লাম। আলো জ্বেলে দিলাম। লিকি গাল্‌চের উপর দাঁড়িয়েই আমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। দেখতে দেখতে যাদু গালচে মিলিয়ে গেল।

লিকি চলে যেতে মনে হল স্বপ্ন দেখলাম না ত? কিন্তু

আমগুলো রয়েছে হাতে, পেটও একেবারে ঢোল হয়ে উঠেছে খেয়ে—এত আর স্বপ্ন হতে পারে না।

যদি আমার বন্ধু লিকির গল্প তোমাদের ভালো লাগে ত আর একদিনের একটা ঘটনা বলব। কি, তোমাদের মত আছে ত ?

যাদুকরের একটি দিন

সেবার বড়দিন এল।

বড়দিনের আগের দিন রাতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা মোজা ঝুলিয়ে রাখে। তার পরদিন ঘুম থেকে উঠে দেখে সাণ্টাক্লজ বুড়ো তাদের সেই মোজা ভর্ত্তি করে দিয়েছেন রকমারি খেল্না। আমি এখন বুড়ো হয়ে গেছি কিনা, তাই আর ওরকম মোজা ঝুলিয়ে রাখি না। ঐটুকু মোজার ভেতরে ত আর আমার সব কটা দরকারী জিনিস বুড়ো দিতে পারবেন না। একটা দাড়ি কামাবার সরঞ্জামই ত ওতে ধরবে না। কিন্তু সেবার বড় দিনের ভোরে ঘুম ভাঙতেই দেখি, আমার মাথার কাছে কি যেন ঝুলছে। ধীরে ধীরে বেলুনের মত দুলতে দুলতে সেটা একেবারে বুকের উপর চলে এল। এবার মাথা নুইয়ে আমাকে জানাল নমস্কার, সঙ্গে সঙ্গে বিছানার উপর পড়ল একখানা খামে আঁটা চিঠি, একটা টার্কী পাখীর ডিম, একটা গলাবন্ধ আঁটবার পিন, একখানা ১৯৩১ সালের নতুন ডায়েরী। আমি তখনি বুঝতে পারলাম, আমার বন্ধু লিকি আমাকে বড়দিনের উপহার পাঠিয়েছেন। আর কেউ কি আর এমন অদ্ভুত উপায়ে উপহার পাঠাতে পারবে? চিঠিখানা পড়ে দেখলাম, তিনি আমাকে লিখেছেন

ছুটির একটা দিন আমি যদি ওঁর সঙ্গে কাটাই উনি খুব খুশি হবেন। আর গলাবন্ধ আঁটবার পিন আর ডায়েরীটা এমন মন্ত্রপূত করে দিয়েছেন যে, কোথাও আর নাকি তারা হারাবে না। এখন লিকিকে সেদিন কথায় কথায় বলেছিলাম, আমার মাসে দশটা ডায়েরী আর সতেরোটা পিন হারিয়ে যায়। তাই তিনি এগুলো পাঠিয়েছেন।

ঠিক দিনটাতে লিকির ওখানে গিয়ে হাজির হলাম। এবার আবতুল মক্কার এসে দরজা খুলে দিল। সে বেয়ারার পোষাক পরেছে, আজ আর পাগড়ী আর চাপকান নেই। সে আমার কোট আর টুপি খুলে নিল, কিন্তু একবারও তাকে কোট বা টুপি ছুঁতে হল না। আমার তু'হাত দূরে দাঁড়িয়ে একবার হাত তুলতেই কোট আর টুপি আপনা হতে গা থেকে খসে গিয়ে একটা ব্রাকেটের সঙ্গে ঝুলে রইল। কিন্তু এতে বিশেষ আশ্চর্য হলাম না, আর একদিন এসে যে সব অদ্ভুত ব্যাপার দেখে গেছি !

ঘরে ঢুকতেই লিকি আমাকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেন। পম্পিও আমাকে দেখে আহ্লাদে আটখানা। সে আগুনের কুণ্ডে বসে ডানা ঝাপটাতে শুরু করল। আগুনে হাওয়া লাগলে ধোঁয়া ত হবেই। ঘর ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে গেল। কিছু দেখা যায় না, তার উপর আবার চোখ দিয়ে পড়ছে জল। লিকি তাড়াতাড়ি যাতুদণ্ডটা টেবিল থেকে তুলে নিলেন। এক নিমিষেই তুষ্টু খোকা পম্পি একেবারে চুপ।

লিকি এবার বললেন, "আমার ইচ্ছে ছিল দুপুরের খাওয়াটা আমরা জাভায় গিয়ে সারব, দেখছি তা হয়ে উঠবে না। দু-একটা জরুরী কাজ আছে আজই সেরে ফেলতে হবে। আপনি ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে যেতেও পারেন, না হয়ত এখানে শুয়ে শুয়ে তামাক টানুন, আমি এলাম বলে।"

আমার ভয় হল, লিকি ছাড়া একদণ্ডও কি আমি এবাড়ীতে তিষ্ঠোতে পারব। তাই তাড়াতাড়ি বললাম, "অবশ্য, আপনার যদি অসুবিধে না হয়, আমিও আপনার সঙ্গে যেতে চাই।"

"বেশ ত কিন্তু আপনাকে আমার সঙ্গে বেরুতে হলে অদৃশ্য হতে হবে। দাঁড়ান, একটু তালিম দিয়ে নেয়া যাক। এই 'তমসা টুপি' আপনাকে পরতে হবে। খবর্দার নীচের দিকে চাইবেন না, মাথাঘুরে পড়ে যাবেন। টুপি পরে সর্বদা সামনের দিকে সোজা তাকাবেন।

তিনি এই বলে আমার হাতে দিলেন একটা কালো টুপি। মস্তবড় চূড়া তার। রং তার এত কালো যে কি বলব! মনে হয়, টুপি ত নয় যেন অন্ধকার একটা কালো গর্ত টুপির মত করে তৈরী করা হয়েছে। ভাল করে ধরে দেখলাম, কিন্তু আঙুলে ছোঁয়াই লাগছে না। মনে হচ্ছে, খানিকটা হাওয়া ধরে আছি, কেমন একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব যেন! কাপড় দিয়ে এমন টুপি তৈরী করা যায় না। রবারের টুপি বরং হতে পারে।

টুপি ত পরলাম। চেয়ে দেখি, আমার একখানা হাত আর দেখতে পাচ্ছি না! হাত নেড়ে দেখলাম, হাত ত ঠিকই আছে। তবে? আমার নাকটা খুব উঁচু, অমন নাক নাকি সচরাচর দেখা যায় না। আমার আগে আগে চলে আমার নাক। কিন্তু কই সে নাকটিকে ত আর দেখা যাচ্ছে না। কি হলরে বাবা! এবার চাইলাম পায়ের দিকে, ওকি সমস্ত শরীরটাই যে উবে গেছে। মাথাঘুরে গেল, পড়ে যাচ্ছিলাম! তাড়াতাড়ি আমার অদৃশ্য হাত দিয়ে টেবিলটা আঁকড়ে ধরলাম। লিকির উপদেশ মনে পড়ল, সামনের দিকে তাকাতে হবে, নীচের দিকে তাকালেই বিপদ। সামনের দিকে সোজা তাকালাম। মাথা ঘোরা সেরে গেল, শরীর ভাসতে ভাসতে কার্পেটের উপর চলল।

লিকি বললেন, "টুপিটা এবার পকেটে রাখুন। রাস্তায় নেমে পরবেন।"

কিছুক্ষণ পরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। এবার আর আবদুল মক্কারের দেখা মিলল না। ব্র্যাকেট থেকে কোট আর টুপি আপনি উড়ে এসে গায়ে জুড়ে বসল।

ট্যাক্সিতে উঠে লিকি বললেন, "আজ অনেক কাজ। প্রথমে একটা দুষ্ট কুকুরকে সাজা দিতে হবে। বহু লোককে সে কামড়েছে, যদি ওকে সাজা না দিই ত পুলিশ ওকে মেরেই ফেলবে। তারপর একখানা চেক শূন্যে উড়িয়ে দিতে হবে। আরও দু-একটা ছোট ছোট কাজ আছে। দেখুন,

আমি জাঁকজমক করে কাজ করতে ভালবাসিনে। এমনি ছোটখাটো দু-একটা উপকার মাঝে মাঝে করতে পেলেই আমি খুশি। এই ট্যাক্সি-ড্রাইভারের কথায়ই ধরুন না। ওর মুখে কত ব্রণ দেখছেন! ওগুলো সারিয়ে দিলে ও নিশ্চয়ই খুশি হবে।"

আমাদের ড্রাইভারটির মুখে ভীষণ ব্রণ ছিল। ব্রণ সারাবার যত ওষুধের বিজ্ঞাপন কাগজে বেরোয়, সেই সব কোম্পানীগুলো ওর ফটো তুলে কাগজে নিশ্চয়ই বিজ্ঞাপন দিত; তার নীচে লেখা থাকত, আগে কি ছিলাম। সত্যি আমি এত ব্রণ কারো মুখে এক সঙ্গে দেখি নি। লিকি তার ছাতার বাঁটটা ঘোরাতে লাগলেন। উঁকি মেরে দেখলাম ট্যাক্সি ড্রাইভারের কপালের উপরের দুটি ব্রণ মিলিয়ে গেছে। ঠিকানায় পৌঁছুতে পৌঁছুতে ওর সব ব্রণ মিলিয়ে গিয়ে মুখখানা একেবারে টোমাটোর মত পালিশ হয়ে গেল। কিন্তু ড্রাইভার কিছু বুঝতে পারল না, গাড়ীতে তার একখানাও আরসী লাগানো ছিল না কিনা!

আমরা এবার নেমে পড়লাম, লিকি ড্রাইভারের হাতে টাকা গুঁজে দিলেন।

"কর্তা, এক ফার্দিঙ্ দিলেন নাকি!"

"ভাল করে তাকিয়ে দেখ ত?" লিকি হেসে বললেন।

"মোহর! উনিশ শ' চৌদ্দ সালের পর আর মোহরের মুখ দেখি নি।"

লিকি এবার চলতে চলতে আমাকে বললেন, "আমার একটা যাদু-থলে আছে, কিন্তু তা থেকে শুধু সোণার মোহরই বেরোয়, নোট পাওয়া যায় না। তার কারণ কি জানেন, এই থলেগুলো যখন তৈরী হয়, তখন লোকে ছাপার কাজ জানত না। যুদ্ধের আগে মোহর বকশিশ করলে কেউ অবাক হত না। কিন্তু আজকাল হচ্ছে নোটের রাজত্ব। তাই এই থলেটা আর বার করিনে। লোককে অবাক করে লাভ কি বলুন ? জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। এবার তমসা টুপিটা পরে নিন। ভিড়ের ভেতর কখনও এসব টুপি পরতে নেই। আপনার সঙ্গে ধাক্কা লাগলে লোকে ভয় পাবে।"

আমি টুপিটা পরে অদৃশ্য হয়ে গেলাম। লিকি ছাতা খুললেন, খানিকক্ষণ পরে তাঁকেও আর দেখা গেল না। আমি যাতে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলতে পারি, তাই ছাতার ডগাটুকু শুধু জেগে রইল। পাখীর মত উড়ে চলল ছাতার ডগাটুকু।

"এই পার্কটায় এখন আমরা ঢুকব, গেটটা বন্ধ করে দেবেন," আমার কানে কানে লিকি বললেন। কেন না, অদৃশ্য হলে কি হবে, আমাদের স্বর কিন্তু সবাই শুনতে পারে।

পার্কের ভেতরে ঢুকে, গেটটা বন্ধ করে দিলাম, একটা মস্তবড় ডালকুত্তা ছুটে এল আমাদের কাছে। সে মাটি শুঁকছে, চিৎকার করছে, কিন্তু কেমন যেন অবাক হয়ে গেছে।

হয়ত ভাবছে, গন্ধ পাচ্ছি, অথচ মানুষটা গেল কোথায়? এখন এক গ্রেহাউণ্ড ছাড়া অন্য জাতের কুকুরগুলোর দেখার থেকে গন্ধ শোঁকার দিকেই নজর বেশি। গন্ধ শুঁকে শুঁকে সে ঠিক লিকিকে খুঁজে বার করল। তার উপর তার ছাতার ডগাটুকুও শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছিল কি না। কুকুরটা এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল লিকির উপর। হঠাৎ এক কাণ্ড হয়ে গেল। সেই যে ছাতার ডগাটুকু শূন্যে মাথা জাগিয়েছিল, হঠাৎ তার মুখ থেকে এক ঝলক লাল ধোঁয়া বেরুল। কুকুরটা ঘাবড়ে গেল। এবার দেখা গেল লিকির বাঁ পা-খানা। হাটু অবধি পা-খানা মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে। কুকুরটা দাঁত বসিয়ে দিল পায়ের উপর। দেখতে পেলাম, তার ধারাল দাঁতগুলো চকচক করছে। আমি কুকুরটাকে মারতে গেলে লিকি কানে কানে বললেন, "মারবেন না, ওর দাঁতের আর ধার নেই। আমি রবারের দাঁত করে দিয়েছি, শুধু মাড়ির চারটে রেখেছি। ওই চারটে দিয়ে বিস্কুট চিবিয়ে খাবে। ঐ যে ওর মনিবও এদিকে আসছে। এবার পা-খানা লুকিয়ে ফেলি।"

কুকুরের মনিব আসতে না আসতে লিকির পা-খানা অদৃশ্য হয়ে গেল। লিকি এবার কুকুরটার পা ধরে শূন্যে খানিকক্ষণ ঘুরিয়ে ছেড়ে দিলেন। দু-তিনটে ডিগবাজি খেয়ে কুকুরটা শূন্যে খানিকক্ষণ ঝুলে রইল। এমন মজার ব্যাপার আমি ত কখনও দেখি নি। ভেবে দেখ দিকি, একটা কুকুর শূন্যে ঝুলছে, তার জিভ বেরিয়ে পড়েছে, চোখে জমেছে রাজ্যের ভয়!

দাঁত বসিয়ে দিল পা'র ওপর—পৃঃ ৬২

বিকট হাঁ নিয়ে এগিয়ে আসছে—পৃঃ ৭৫

কিছুক্ষণ পরে কুকুরটা ধপাস্ করে মাটিতে পড়েই কেঁউ কেঁউ করতে করতে পালিয়ে গেল।

মনিবের ত চক্ষু স্থির। এদিকে আমরা ততক্ষণে পার্কের গেট খুলে রাস্তায় নেমে এসেছি। রাস্তায় নেমে এবার টুপি পকেটে পুরে আবার সাধারণ মানুষ হলাম। ওঃ! এতক্ষণে আরামের নিশ্বাস ফেলা গেল। তোমরাই বল ত, আরাম নয়?

একটা ট্যাক্সি ডেকে আমি আর লিকি উঠে পড়লাম, লিকি বললেন, "লোকটার যদি এক ফোঁটা বুদ্ধি থাকে ত ঐ কুকুরটা দেখিয়ে ও বেশ তু-পয়সা রোজগার করতে পারবে। ছ'পেন্স দক্ষিণা দিয়ে ছেলে বুড়ো সবাই একটা রবারের দাঁতওলা কুকুরের কামড় খেতে নিশ্চয়ই রাজি আছে।"

তা আছে বৈকি। এই ত আমিই একজন। শোনো, তোমরা যদি কোনো মেলায় রবারের দাঁতওলা কুকুর দেখতে পাও, আমাকে জানিও, আমি একবার পরখ করে দেখতে চাই রবারের দাঁতের কামড় কি রকমের।

লিকি আমাকে বলতে লাগলেন, "আপনি নিশ্চয়ই রবারের দাঁতের কথা শুনে অবাক হয়ে গেছেন। কারণ, ইওরোপে এ সব জিনিস নতুন। আমরা ইওরোপের যাতুকরেরা এখনও এ-যুগের তৈরী জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমরা সেই পুরনো যুগেই রয়ে গেছি। এদিকে কিন্তু আমেরিকা খুবই আধুনিক। এই কৌশলটা ত আমি একজন ব্রেজিলের যাতুকরের কাছ থেকে শিখেছি। ১৯১২ সালে

জার্মাণীর ব্রোকেনে পৃথিবীর যাদুকরদের যে কংগ্রেস হয়েছিল, তাতেই সে এই খেলা দেখিয়েছিল। সেখানে নাকি জাগুয়ার, কুমীর আর আনাকোণ্ডা সাপের দাঁত তারা মন্ত্রবলে রবারের করে দিয়েছে। আর তা হবেই বা না কেন? রবারগাছ ওখানে এত জন্মায় যে, রবার নিয়ে দু-একটা খেলা ত ওদের তৈরী করতেই হবে। হঁা, এবার আমরা চলেছি এক হাড়-কৃপণ মহাজনের বাড়ী। নাম তার ম্যাক-ষ্টেওয়ার্ট। অবিশ্যি, ওটা তার সত্যিকারের নাম নয়। তার সত্যিকারের নামে এতগুলো 'জেড্' আছে যে, উচ্চারণই করা যাবে না। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কি জানেন? কারো আসল নাম জানা না থাকলে তার উপর যাদুবিদ্যার কোনো ফল ফলে না। এই জন্যেই এই সব সুদখোর মহাজনেরা নিজেদের আসল নাম বাইরে বলতে চায় না, কি জানি কোনো যাদুকর যদি শুনতে পেয়ে তাদের দোরের হাতল, কি ইজি-চেয়ার বানিয়ে দেয়! তারপর যাদুকরেরাও নিজেদের আসল নাম কাউকে বলে না। দেখুন না, লিকি আমার আসল নাম নয়, যেমন এই শহরের আসল নাম নয় লণ্ডন। এই শহরের আসল নাম জানেন মেয়র। নতুন মেয়র যখন আসেন, পুরনো মেয়র তাঁর কানে কানে আসল নামটি বলে দিয়ে যান। এমনি ধারা হাজার বছর ধরে চলে আসছে। কি জানি, কোনো মন্দ যাদুকর শহরকে যদি ব্যাল্লিবুনিয়ন, টিম্বাকটু কি অমবোরোমবঙ্গা বানিয়ে ছেড়ে দেয়!

"এই রাজা-রাজড়াদেরই দেখুন না কেন? একজনের পঞ্চাশ-ষাটটা বা তারও বেশি নাম। আপনি ওঁদের যদি যাদু করতে চান, আপনাকে এক নিশ্বাসে পুরো নামটা বলে যেতে হবে, নইলে কোনো ফলই হবে না। এই জন্যে রাজাদের যদি আসল নামও জানা যায়, তাহলে এক নিশ্বাসে সেই পাঁচহাত নাম বলতে গিয়ে আপনি দম বন্ধ হয়ে মারা পড়বেন। একটা নাম শুনবেন: অগাষ্টাস বেনহাদ শার্লিমান দাগোবার্ট ইথেল উলফ্ ফ্রেড্রিক জেনসেরিক হার্ডিক্যানিউট্ ইক্সলিলককলিট্ল্ জেজোইয়াকিম কামেহামেহা লিওনিডাস ম্যাক্সিমিলিয়ন নেপোলিয়ন ওবাদিয়া পলিক্র্যাটিস কুইরিনাস রেহোবোয়াম সুবিলুলিয়ুমা তারাসিকোডিসা উমসিলিকাজি ভ্যালেগাটিনিয়ান ইউসিহিতো জেডেকিয়া। এক নিশ্বাসে একটু ভুল না করে আপনি বলতে পারবেন?"

আমি ঘাড় নাড়লাম। তোমরা একবার চেষ্টা করে দেখ ত পার কি না।

ট্যাক্সি এবার দাঁড়াল। লিকি বললেন, "আসুন, আমরা পৌঁছে গেছি। এই সুদখোর মহাজনটা বড় পাজি। কাউকে টাকা ধার দিয়ে তার চার পাঁচ গুণ আদায় করে নেয়। আমি ওকে বারণ করেছি বলে, আমার উপর খুব চটে আছে। এক কাজ করুন, আপনি আগে আগে ওর আফিসে ঢুকুন, আমি পেছনে পেছনে যাব অদৃশ্য হয়ে। আমি আজকে ওকে বিশেষ কিছু বলব না, শুধু কয়েকটা নামের দস্তখত

উড়িয়ে দেব, যাতে ও তাদের কাছ থেকে টাকা না আদায় করতে পারে।"

ট্যাক্সি থেকে নেমে আমরা ম্যাকষ্টেওয়ার্টের আফিসে ঢুকলাম। বেশ বড় আফিস। লিকি সিঁড়িতেই তমসা টুপি পরে মিলিয়ে গেলেন। আমি ম্যাকষ্টেওয়ার্টের কাছে গিয়ে বললাম, "আমি হাজার পাউণ্ড ধার করতে চাই।" লোকটাকে আমার একটুও পছন্দ হল না। আমার যদি কখনও টাকার দরকার হয়, আমি অমন লোকের কাছে টাকা ধার নেব না। ধার করতে হলে আমার বন্ধু ডাক্তার বার্ণেট উল্‌ফের কাছে যাব। তাঁর কি মত জানো? সুদ নেয়া মহাপাপ। এখনও আমি তাঁর কাছে দু'পেন্স আধ পেনি ধারি। তোমাদেরও নিশ্চয়ই এমনি দু-একজন বন্ধু আছেন।

যখন ম্যাকষ্টেওয়ার্টের সঙ্গে কথা বলছিলাম, দেখলাম লিকির ছাতার ডগাটা টেবিলের একরাশ দলিল আর খতের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। লিকি বোধ হয় ছাতার ডগাটা দিয়ে দলিলের দস্তখতগুলো মুছে দিচ্ছেন। ম্যাকষ্টেওয়ার্ট ব্যাপারটা দেখে অবাক হয়ে গেল, কিন্তু কোনো কথা বলল না। সে নিশ্চয়ই ভেবেছিল, ওকথা বললে আমি ওকে পাগল ভাবব। এবার ছাতার ডগাটা টেবিল ছেড়ে মেঝেয় নেমে পড়ল। আমি ম্যাকষ্টেওয়ার্টকে বললাম, "অত সুদে টাকা ধার আমি করব না।" ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম, আমার পেছনে পেছনে লিকির ছাতার ডগাটা খট্ খট্ করে আসছিল। হঠাৎ

ডগাটা বোঁ করে শূন্যে উঠে শূন্যেই কি যেন লিখতে লাগল। তোমরা নিয়ন-আলোর বিজ্ঞাপন নিশ্চয়ই দেখেছ। এই লেখাগুলো থেকেও অমনি আলো বেরুচ্ছিল। উলটো করে কি লেখা ছিল জানো?

'জসেস রবা ররেপ'

ম্যাকস্টেওয়ার্টের মুখ যদি দেখতে তোমাদের নিশ্চয়ই হাসি পেত। তার চোখ ঠিকরে পড়ছিল, চুলগুলো সজারুর কাঁটার মত ভয়ে খাড়া হয়ে উঠছিল।

ট্যাক্সিতে চড়ে লিকি বললেন, "কাজ হয়ে গেল, এখানে আর আসতে হবে না। লোকটা মহাজনী ব্যবসা করুক না, কিন্তু অত চড়া সুদ নেবে কেন? যাক্ ভবিষ্যতে ওর কাছে যারা ধার করতে আসবে তাদের আর ভয় নেই। হাঁ, কাজ ত শেষ হল, এখন বলুন দুপুরের খাওয়া কোথায় সমাধা করা যায়? জাভা যাবেন? বড্ড দেরী হয়ে গেছে। এতক্ষণে সেখানে সূর্য ডোবে ডোবে। কোনো হোটেলে হয়ত খাবারই মিলবে না। তারচেয়ে ভারতবর্ষে চলুন না? মাণ্ড এই সময়টায় বেশ ভালো জায়গা। আমরা যাদু-গাল্‌চেয় চড়েই যাব। আপনার জন্যে একটা প্যারাশুট নিতে হবে, কি জানি দৈবাৎ যদি মাথাঘুরে পড়ে যান, আর কবচও একটা বেঁধে দিতে হবে, পথে রাক্ষস আর জিনের ত অভাব নেই। তার উপর আর এক আপদ আছে মশা। একটা তেল গায়ে মালিস করে নেবেন, মশা আপনাকে ছুঁতেও পারবে না।"

লিকির বাড়ীতে ফিরে আধঘণ্টার মধ্যে আমরা তৈরী হয়ে নিলাম। তোমরা বোধ হয় ভাবছ, জিনিসপত্তর ত আর কিছু সঙ্গে যাবে না, আধঘণ্টা কেন, দশ মিনিটে তৈরী হতে পারতে তোমরা। কে বললে জিনিসপত্র সঙ্গে যাচ্ছে না? গরম দেশের পোষাক যাচ্ছে একগাদা, যাচ্ছে মোটাসোটা সব কেতাব, আরও কত কি, তার নামও আমি জানি না। এত জিনিস প্যাক করতে এগারোটা লোকের ২২ ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু যাদুকরের বাড়ীর ব্যাপারই আলাদা। বইপত্তর, কাপড়-চোপড় নাচতে নাচতে এসে একটা প্রকাণ্ড বাক্সে জড়ো হল, তারপর একটা সাপ বেরিয়ে এসে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বাক্সটাকে জড়িয়ে ধরল, যে খোলে কার সাধ্য! লিকি হেসে বললে, "ক্লেমেনটিনা ছিল বলে দড়ি আমাকে কিনতে হয় না। আর ও ত দিব্যি আরামে পৃথিবী ঘুরে আসে। দাঁড়ান, এবার আপনাকে একটু মন্ত্রটন্ত্র পড়ে তৈরী করে নিতে হবে। পাঁচ মাইলের উপরে, বাতাস খুব হাল্কা, তখন বাঁচতে হলে প্রচুর হাওয়া চাই। আমি উড়ো জাহাজে হাওয়া জোগাবার একটা যন্ত্র আপনাকে দিতে পারি, কিন্তু যন্ত্র যদি খারাপ হয়ে যায় তাহলেই বিপদ। আমি যন্ত্রের যুগে থেকেও যন্ত্র পছন্দ করিনে। আমার পুরনো যাদুবিদ্যাই ভালো। আমি আপনাকে একটা ওষুধ দেব, ওষুধটা খেলে আধঘণ্টা পরে তার কাজ আরম্ভ হবে। কিন্তু আমরা ত এখুনি রওনা হচ্ছি, তাই আপনার শরীরের একটা জায়গার

স্ক্রু খুলে· আমি ওষুধটা সেখানে ঢেলে দেব। আপনার পা-খানা এই টুলটার উপর রাখুন ত ? অলিভার, ট্রিসম্যাজিস-টাসের তিন নম্বর ভলুমখানা নিয়ে এস ত।"

অলিভার এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। এবার সে উঠে গিয়ে তাক থেকে সেই বিরাট বইখানা পেড়ে নিয়ে এল। লিকি বইখানা খুলে একটা মন্ত্র পড়লেন। তারপর আমার বাঁ পা-খানা হাঁটুর কাছ থেকে খুলে নিলেন। একটু রক্ত পড়ল না, ব্যথাও পেলাম না। মোটরের চাকায় যে রকমের পাম্প দিয়ে বাতাস ভরে দেয়, অমনি চেহারার একটা যন্ত্র নিয়ে আমার কাটা জায়গায় বসিয়ে পাম্প করতে লাগলেন। মনে হল, সমস্ত শরীরে যেন একটা গরম হাওয়া চলাচল করছে। এবার পা-খানা নিয়ে আবার এঁটে দেয়া হল, যেমন করে মিস্ত্রী টেবিলের পায়া পেরেক ঠুকে টেবিলের সঙ্গে এঁটে দেয়।

এবার এল আবতুল মক্কার। সেই প্রথম দিন তাকে যে পোষাকে দেখেছিলাম সেই পোষাক তার পরনে।

লিকি বললেন, "এই পোষাকে জিনকে যেমন মানায়, আজকালকার লম্বা কোটে কি তেমন মানায়! তবে কি জানেন, সাধারণ লোক ওকে দেখে ভয় পাবে বলেই আমি পাগড়ী, চাপকান ছেড়ে লম্বা লেজ ঝোলা কোট ওকে মাঝে মাঝে পরতে বলি। এই লম্বা টেইল কোটগুলো কোত্থেকে এসেছে জানেন ? পারস্য থেকে। দ্বিতীয়

চার্লসের রাজত্ব থেকে ইংলণ্ডে এর চলন হয়েছে। পারস্যে বহুদিন আগে এক রাজা ছিলেন, তাঁর নাম নুসিরভান। তার সভায় সব পাখাওয়ালা জিন ছিল। কিন্তু রাজা ভাবলেন, সব প্রজাই যখন তাঁর চোখে সমান, তখন জিনদের পাখা নিয়ে ঘুরতে দেয়াও উচিত নয়। তাই তিনি দরজিকে ফরমাস দিয়ে এই টেইল কোট তৈরী করলেন। আর একটা কাজ তিনি করতে পারতেন, জিনদের পাখা কেটে দেওয়া। তাহলে কিন্তু তাদের দিয়ে কোনো কাজই পাওয়া যেত না। একদিন রাজার যাদু-আঙটি চুরি যেতে জিনেরা সব উড়ে চলে গেল। পারস্যের লোক কিন্তু তবু টেইল কোট পরতে লাগল"।

আবদুল মক্কার নুয়ে পড়ে সেলাম জানিয়ে বলল, "হে যাদু-সম্রাট! আপনার অধম দাস পম্পি আপনার কাছে এক প্রার্থনা জানাচ্ছে।"

"হে চতুর! কি সে প্রার্থনা বল?"

"সে আমাদের যাত্রার সহচর হতে চায় এবং সে শপথ করছে যাত্রাপথে তার ব্যবহার হবে পয়গম্বরের উটের মতই অনিন্দ্যনীয়।"

"অনুমতি দিলাম, একটি অগ্নিকুণ্ড সত্বর প্রস্তুত কর। যাদু-গালচের উপর বিস্তৃত করে দাও অ্যাসবেস্টসের আস্তরণ। আর আমার এই মহানুভব অতিথিকে সজ্জিত করে দাও একটি প্যারাশুট এবং একটি লাইফ-বেল্টে। কি জানি, যদি শূন্য হতে তিনি ভূতলে নিপতিত কিম্বা সাগরগর্ভে নিমজ্জিত হন।"

"যথা আজ্ঞা প্রভু!"

আবদুল মক্কার চোখের পলকে আমাকে প্যারাশুট আর লাইফ-বেল্ট এনে দিল। লিকি হাতে দিলেন এক যাদুদণ্ড। এবার আবদুল মক্কার একখানা বিরাট গাল্‌চে নিয়ে এল। তার উপর অদ্ভুত ছবি আঁকা, আরবী অক্ষরে কি যেন লেখাও রয়েছে। আমরা তার উপর উঠে বসলাম। এবার আবদুল বাক্স আর অগ্নিকুণ্ড এনে রাখল, পম্পি উড়ে এসে তার ভেতরে বসে পড়ল।

"চোখ বুজুন," লিকি চেঁচিয়ে বললেন। চোখ বুজলাম। কানে তালি দেয়ার শব্দ শুনতে পেলাম। আমি জানি না, কি করে আমরা ঘরের ছাদ ফুঁড়ে বার হলাম। আমার জানবারও কোনো ইচ্ছেই ছিল না। ছাদ ফুঁড়ে ওঠাটা একটা বিশ্রী ব্যাপার নয়? আমরা খানিকটা উপরে উঠে আবার নেমে এলাম। লিকি বললেন, "এবার চোখ মেলুন।" তাকিয়ে দেখি চারদিক রোদে ঝলমল করছে।

মনে হল, লণ্ডন থেকে বহুদূরে এসে পড়েছি। লণ্ডনের আকাশ আজ সারাদিন মেঘলা ছিল। নীচে তাকিয়ে দেখে বুঝলাম ব্যাপারটা তা নয়। আমরা মেঘের উপর উঠে এসেছি, আমাদের নীচে মেঘের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবার মেঘের ভেতর দিয়ে নজরে পড়ল ইংলিশ চ্যানেল, তার পরেই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে প্যারিস বাঁয়ে রেখে আমরা উড়ে চললাম। উপর থেকে ইফেল টাওয়ারকে দেখে মনে হল

একটা খেলনা। আমরা এবার আল্পস পর্ব্বতের উপর দিয়ে উড়ে উত্তর ইতালি হয়ে আড্রিয়াটিক সাগরের উপর দিয়ে উড়ে চললাম। রওনা হওয়ার দশ মিনিটের মধ্যে গ্রীস ছাড়িয়ে গেলাম। সূর্য এবার অনেক উপরে, ভূমধ্যসাগর নীচে বিছিয়ে আছে। লিকি একটা কবচ আমার গলায় পরিয়ে দিলেন।

লিকি বললেন, "আর দশ মিনিটের মধ্যে হয়ত একটু আধটু বিপদ ঘটবে। আপনি জানেন বোধ হয়, সম্রাট সলোমন দুষ্ট জিনদের সব বোতলে পুরে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিলেন। অমনি একটা জিনই আরব্য-উপন্যাসের জেলের জালে উঠেছিল। তাকে নিয়ে কি হাঙামাই না পোয়াতে হয়েছিল! এখনও ও হাঙামা মেটেনি। প্যালেস্তাইনের হাইফায় আজকাল একটা মস্ত বন্দর গড়ে উঠেছে, ওখানে মাঝে মাঝে দু-একটা বোতল সমুদ্র থেকে উঠছে। কিন্তু আজকালকার মানুষের ত আর জিনে বিশ্বাস নেই। তারা বোতল খুলে দেখছে, কি আছে। এদিকে জিন হাওয়া হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। এখন এই জিনগুলোর ভারী রাগ! কার না রাগ হয় বলুন? আজ তিন হাজার বছর ধরে সমুদ্রের তলায় পচে মরছে ওরা। এদিকে আজকালকার মানুষের কোনো ক্ষতি ওরা করতে পারছে না, তাদের আছে কি না বিজ্ঞান! বরং ওদের কলকারখানার ভয়ে অস্থির হয়ে তারা শূন্যে উড়ে পালাচ্ছে। সেখানেও কিন্তু ভারী বিপদ। সলোমনের যুগে ত আর বেতারে খবর পাঠাবার উপায় ছিল না। তখন দিব্যি আরামে

শূন্যে থাকা যেত। এখন এই বেতার হয়ে তারা আর শূন্যেও থাকতে পারছে না রোজই তাদের পেট ফুটো করে বেতারের খবর এক দেশ থেকে আর এক দেশে যায়। অবশ্য, মানুষ হলে কবেই মরে যেত, জিন বলেই এখনও বেঁচে আছে। কিন্তু না মরলে কি হবে, সকলের পেটেই অম্বলের ব্যথার মত এক রকম ফিক্ ব্যাথা উঠছে। এই আবতুল মক্কারের কথাই ধরুন না। যখন প্রথম বেতারে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা হয়, বেচারা ত একেবারে ব্যথার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছিল। শেষে এক বৈজ্ঞানিক বন্ধুর পরামর্শে ওকে একটা যন্ত্র তৈরী করে দিয়েছি। এখন আর ওর ব্যথা লাগে না।

"হাঁ, কি বলছিলাম ? জিনেরা এই সব কাণ্ডকারখানা দেখে আরো রেগে গেছে। তারা ত আর বৈজ্ঞানিকদের কিছু করতে পারে না, তাই আমাদের মত নিরীহ লোকদের দেখতে পেলেই আক্রমণ করে। অবশ্য, ইউরোপের কাছে আসতেও ওরা সাহস পায় না। এত রেডিও আছে এখানে। এলেই পেটের ব্যথা বেড়ে যাবে। আপনি ওদের ভয় পাবেন না। যদি আক্রমণ করে, আপনার কিছুই করতে পারবে না। আপনার গলায় ঝুলছে কবচ, ওতে কোরাণের শ্লোক লেখা আছে। আপনার কাছে কোন জিন এলে কোরাণের শ্লোক পড়লেই পালিয়ে যাবে। সে কি আপনি কোরাণ পড়েন নি ? আমাদের যাতুকরদের আটরকমের ধর্ম। আমি যদি খাঁটি হিন্দু না হই ত রাক্ষসরা আমাকে খেয়ে ফেলবে। চীনে

গিয়ে যদি তাও ধর্মে বিশ্বাস না করি তাহলে তাওদের সেই অপদেবতা ভীষণ সবুজে রঙের সাপটা আমাকে পিষে ফেলবে। তিব্বতে আপনি বৌদ্ধধর্ম না নিয়ে ত যেতেই পারবেন না। ওখানে যে কত দৈত্যদানো আছে তার ঠিক নেই। যাক গে কোরাণের শ্লোক না বলতে পারেন, আপনি ইংলণ্ডের রাজাদের নামই আওড়াবেন। না, না এলবার্ট থেকে দরকার নেই, বিজয়ী উইলিয়াম থেকে শুরু করলেই হবে।”

ভূমধ্যসাগরের ম্যাপের ডান কোণে যে জায়গাটা ওখানে আমরা এরই মধ্যে এসে পড়লাম। কত জাহাজ চলেছে সুয়েজখালের দিকে। সূর্য এবার আগুনের হল্কা ছুঁড়ে মারছে। আমার গরমকোট খুলে ফেলতে ইচ্ছে হল। কিন্তু কবচ, প্যারাশুট আর লাইফ-বেল্ট রয়েছে যে, কি করে খুলব। লিকি বুঝতে পেরে যাদুদণ্ড ছুঁইয়ে দিলেন আমার পোষাকের উপর। দেখতে দেখতে সমস্ত পোষাকটাই নরম সিল্কের হয়ে গেল। এবার আরবদেশ। প্রথমে কিছু গাছপালা দেখা গেল, তার পরেই এল বালি, শুধু লাল বালি। মাঝে মাঝে দু-একটা তালগাছও দেখা যাচ্ছিল।

হঠাৎ নীচে একটা বালির ঢিবি দেখা গেল। লিকি দেখে বললেন, “বালির ঝড় আসছে। সাবধান থাকুন, এ নিশ্চয়ই সেই বদমায়েস জিনগুলোর কীর্তি!” বলতে বলতেই আমাদের নীচে, সামনে একটা বাজ পড়ল যেন, আর তারই মধ্যে দেখা গেল এক বিরাট মূর্তি, বিকট হা নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে

আসছে। লিকি তার যাদুদণ্ডটা একবার নাড়তেই মূর্তিটা থেমে গেল। আমরা তার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেলাম। এবার দেখা গেল মূর্তিটা আমাদের পেছনে পেছনে একখণ্ড কালো মেঘের মত এগিয়ে আসছে, তার বিরাট মুখের মধ্যে জ্বলছে আগুন। আমি নিজের যাদুদণ্ডটা ওর দিকে তুলে ধরে বিজয়ী উইলিয়াম থেকে শুরু করে ইংলণ্ডের রাজাদের নাম আওড়াতে লাগলাম। জিনটা অস্থির হয়ে উঠল; দেখলাম, কেমন যেন ফাটা বেলুনের মত চুপ্‌সে যাচ্ছে। তবু কি পেছু ছাড়ে! এবার একটা মুস্কিলে পড়লাম। তৃতীয় হেনরি ঠিক কোন সালে রাজা হলেন, মনে করতে পারছিলাম না। তাকিয়ে দেখি, আবার জিনের মুখখানা বেশ ফুলে উঠছে! হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তার মুখখানা আবার চুপ্‌সে গেল। কিন্তু পেছনে ছুটে এলে কি হবে, আমাদের যাদু-গাল্‌চের একশ' গজের মধ্যে সে আসতে পারল না। মাঝে মাঝে মুখ থেকে আগুনের ফুলকি বার করে আমাদের দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগল। এবার লিকি বললেন, "আমি এটাকে দেখছি, আবদুল মক্কাব তুমি সামনেরগুলোকে তাড়াও।"

লিকির যাদুদণ্ড থেকে এবার খানিকটা ভায়োলেট রঙের ধোঁয়া বেরিয়ে এল। তোমরা ল্যাসোর নাম শুনেছ? এই ধোঁয়া দেখতে ঠিক ল্যাসোর মত দেখাচ্ছিল, জিনের গলায় গিয়ে এই ধোঁয়ার ল্যাসো আটকে গেল। তারপর সোজা

ব্যাপার! ছেলেরা যেমন বর্শিতে মাছ বিঁধলে টেনে নিয়ে আসে, তেমনি করে লিকি জিনটাকে গলায় ল্যাসো বেঁধে টেনে নিয়ে এলেন। জিনটা এরই মধ্যে একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল। মোটে কুড়ি ফুট লম্বা তার শরীরটা। লিকি এবার পম্পিকে হুকুম দিলেন, "পম্পি ওর নাকটা কামড়ে ছিঁড়ে নিয়ে এস।" পম্পি সোজা উড়ে গিয়ে তার নাকটা নিয়ে চলে এল। এবার ল্যাসোটা খুলে নিতেই জিনটা পালিয়ে গেল।

লিকি হেসে বললেন, "আর ভুলেও কখন ও আকাশের পথিকের উপর আক্রমণ করবে না। দেখুন, দেখুন, ঐ আবার একটা তেড়ে আসছে।"

তাকিয়ে দেখলাম, সত্যিই আমাদের বাঁপাশে একটা বেগুনে রঙের জিন ছুটে আসছে, কি প্রকাণ্ড তার দাঁত দু'টো, হাতিকেও হার মানায়। কিন্তু ছুটে আসতে আসতে জিনটা হঠাৎ পেটে হাত দিয়ে বসে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে উঠে ছুটে পালিয়ে গেল আর একদিকে। লিকি হেসে বললেন, "আর আমাদের কোনো ভয় নেই। এখন অষ্ট্রেলিয়া থেকে বেতারে খবর পাঠানো হচ্ছে। বাজারের খবর, সিমেণ্টের কত দর, স্পেল্টার কত টন বাজারে পাওয়া যাবে—কে জানে মশাই স্পেল্টার কি জিনিস। কিন্তু ওরই দৌলতে আমরা বন্ধুটির হাত থেকে রক্ষা পেলাম। সে এখন বাড়ী গিয়ে পেটে হয়ত তিমির তেল মালিশ করছে। আপনি নিশ্চয়ই এই ছোটো-

খাটো বিপদে ঘাবড়ে যান নি? দু-একটা অ্যাডভেঞ্চার না থাকলে কি আর বেড়িয়ে আনন্দ পাওয়া যায়!"

আমি হেসে বললাম, "ভয় একটু পেয়েছিলাম বইকি, আর সত্যি কথা বলতে কি, জিন বলতে আমি তখন একমাত্র আমাদের বন্ধু আবদুল মক্কারকেই দেখেছিলাম। কিন্তু এ সব দুর্দান্ত জিনের কথা ত জানতাম না।"

আবদুল মক্কার এবার বলল, "আপনি আমাকে বন্ধু বলে সম্বোধন করে যে আনন্দ দান করলেন, তার তুলনা মেলে শুধু সেই অমৃতে যা একদিন ভগবান, ইসরায়েলদের জন্য বর্ষণ করেছিলেন।"

তোমরা আবার জানতে চেয়ো না সে গল্প। বাইবেল পড়লেই জানতে পারবে।

আবদুল মক্কারের কথার একটা জুতসই জবাবও দিলাম, "তোমার মত একজন গুণশালী ইফ্রিতের বন্ধুত্ব আমার কাছে সম্রাট সলোমনের রত্নাগারের সমস্ত রত্নের চাইতেও শ্রেষ্ঠ।"

কথাটা বলেই বুঝতে পারলাম, এমনি ধরণের কথা বলা মোটেই শক্ত নয়। তোমরাও চেষ্টা করলে এমনি বড় বড় কথা বলতে পারবে, কিন্তু কোথায় বলবে? এক জিন ছাড়া ত কারো কাছে এ রকম কথা বলা চলে না।

লিকি হেসে বললেন, "বাঃ! এই ত আপনি জিনের সঙ্গে কথা বলতে শিখেছেন!"

নীচে এবার দেখা গেল পারস্য উপসাগর।

লিকি বললেন, “পারস্য উপসাগরে এসে পড়েছি। ভারতবর্ষের আর দেরি নেই। আচ্ছা, মাণ্ড না গিয়ে দিল্লী গেলে কেমন হয়? দিল্লী হচ্ছে ভারতের রাজধানী। খুব পুরনো শহর।”

আমি বললাম, “চলুন না, দিল্লীই দেখে আসা যাক!”

গাল্‌চে এবার পারস্যের আর বেলুচিস্তানের দক্ষিণ দিয়ে চলল। কয়েকটা এরোপ্লেন আমাদের নীচ দিয়ে উড়ে যেতে দেখলাম। ভারতবর্ষ থেকে বোগ্‌দাদের দিকে যাচ্ছে ওরা। আমরা সিন্ধু নদীর মোহনা পেরিয়ে এক মরুভূমির দেশে এসে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরেই মরুভূমি মিলিয়ে গেল, গাল্‌চে এবার ধীরে ধীরে চলতে লাগল। সামনেই দেখা গেল যমুনা, তারই গা ঘেঁসে এক মস্ত বড় শহর। তার মসজিদের চূড়াগুলো আকাশ ছুঁয়েছে প্রায়। গাল্‌চে এবার নীচে নামতে শুরু করল। পথে অনেক লোক চলেছে। কিন্তু ওরা একবার আমাদের দিকে তাকিয়েও দেখচে না। লিকিকে জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, “ওরা আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। যাদু-গাল্‌চে নীচ থেকে কেউ দেখতে পায় না। যদি দেখতে পেত, তাহলে জিনেরা আমাদের উপর নীচ থেকে আক্রমণ চালাত। এবার আমরা কোথায় যাচ্ছি জানেন? আমার ভারতীয় বন্ধু চন্দ্রজ্যোতিষের বাড়ী। তিনি একজন খুব উঁচুদরের যাদুকর।”

গাল্‌চে এবার এসে একটা বাগানে নেমে পড়ল। বাগানটা

খুব সুন্দর। একপাশে একটা ফোয়ারা দিয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরছে। ফুলের গন্ধে হাওয়া ভারী। আমরা গালচে থেকে নেমে পড়লাম। আবছুল মক্কার তোরঙটা আর আগুনের কুণ্ডটা নামিয়ে রাখল। দু'টি পরমাসুন্দরী মেয়ে বাগানে ঢুকলেন। আমার দিকে চেয়ে লিকি বললেন, "এ রা আমার বন্ধুর স্ত্রী, একজনের নাম সীতাবাই, আর একজনের নাম রাধিকা।" লিকি ওদের সঙ্গে উর্দুতে কথা শুরু করলেন। আমি এক সময়ে একটু আধটু উর্দু শিখেছিলাম, তাই বুঝতে পারলাম, চন্দ্রজ্যোতিষ মশাই বাড়ি নেই। এমন সময় আর একটি মেয়ে এলেন। তাঁর কান দু'টো মস্ত বড়। তিনিও চন্দ্রজ্যোতিষ মশাইয়ের স্ত্রী, তবে মানুষ নন, পরী। এই আমি প্রথম পরী দেখলাম। তিনি এসেই পম্পিকে কোলে তুলে নিয়ে, কতকগুলো গন্ধকের টুকরো বার করে খেতে দিলেন। লিকি বললেন, "দেখুন ওকে বেশি গন্ধক খাওয়াবেন না। আমি আবার মোটা ড্রাগন একটুও পছন্দ করিনে। এই দেখুন না, ইওরোপের ড্রাগনগুলো কি বিশ্রী রকমের মোটা! অথচ একটা চীনে ড্রাগন এত সরু যে আপনি ইচ্ছে করলে একটা দড়িতে যেমন গেরো দেয়া যায়, তেমনি গেরো দিতে পারেন ওর শরীরে। একটা জিরাফের গলায় কিন্তু গেরো দেয়া চলে। জিরাফের গলাটা বাঁকিয়ে যদি গেরো না দিতে পারেন তাহলে ওকে নিয়ে কি করবেন আপনিই জানেন। ওত অকেজো হয়ে গেল।

"একটা মোটা গলাওলা জিরাফের কথা আমি জানি যাকে দিয়ে তার মনিব অবশ্যি কিছু কিছু কাজ পেত। তার মনিবের নাম ছিল টমকিন, থাকত অসওয়াল্ডটুইস্‌ন বলে এক জায়গায়। চোরের ভয়ে সে বাড়ীর সিঁড়ি ভেঙে ফেলেছিল। জিরাফের পিঠে চড়ে-সে দোতালা থেকে ওঠা নামা করত। জিরাফটা তার স্বর শুনলেই বুঝতে পারত এবার মনিব উঠতে কি নামতে চাইছেন। চোরেরা যাতে মই লাগিয়ে উঠতে না পারে এইজন্যে টমকিন তাকে এমন ভাবে শেখাল যাতে মই দেখলেই সে লাথি মেরে ফেলে দেয়।

"এদিকে যত চোর বহুদিন ধরে চেষ্টা করেও টমকিনের বাড়ীতে চুরি করতে পারল না। শেষে এক চোরের মাথায় এক ফন্দি এল। সে বহুদিন গ্রামোফোন কোম্পানীতে কাজ করেছিল। সে রেকর্ড তৈরী করতে জানত। টমকিনের গলার স্বর সে রেকর্ডে তুলে নিল। তারপর একটা ছোট্ট মেসিন নিয়ে টমকিনের বাড়ীতে এসে সেই রেকর্ডখানা বাজাল। জিরাফ ভাবলে, তার মনিব এসেছে, সে তাকে পিঠে করে পৌঁছে দিল দোতলায়। এদিকে মনিব তখন সিনেমায় বসে 'থিফ অফ বাগদাদ' ছবিখানি দেখছে। চোরের জারিজুরি ভাঙতে হলে যাদুবিদ্যা জানা চাই। করুক ত দেখি কোন চোর আমার বাড়ীতে চুরি!"

একটু থেমে তিনি বললেন, "চন্দ্রজ্যোতিষ লাহোরে বেড়াতে গেছে, ততক্ষণ চলুন আমরা শহর দেখে আসি।

পরী পম্পিকে কোলে নিলেন—পৃঃ ৭৯

ছাতার বাঁট দিয়ে পেটাতে শুরু করলেন—পৃঃ ৮৪

হে আবদুল মক্কার, তুমি দীর্ঘ দুই ঘণ্টার জন্য রুবা অল খালিতে তোমার বাসগৃহে প্রস্থান করতে পার। সেখানে নাকি তোমার মাতৃস্বসা অসুস্থা। কিন্তু দু'ঘণ্টা পরে প্রত্যাবর্তন করতে একমুহূর্তও যেন বিলম্ব কোরো না। আপনাদেরও বলছি, পম্পিকে বেশি খাবার খাওয়াবেন না।"

এবার আমরা পথে এসে পড়লাম। গলিটা বড় সরু। লিকি চলতে চলতে বল্‌লেন, "চন্দ্রজ্যোতিষের স্ত্রীরা পরমা-সুন্দরী রূপসী। ওদের রূপ যাতে বজায় থাকে, তার জন্য চন্দ্রজ্যোতিষ রোজ দু'ঘণ্টা মন্ত্র পড়েন। সম্রাট সলোমন তাঁর রাণীদের রূপ বজায় রাখবার জন্য এই মন্ত্রই পড়তেন। কিন্তু তাতে খুব ফল হয়নি। কি করে ফল হবে? তাঁর ছিল তিনশ' স্ত্রী, সকলের কাছে গিয়ে রোজ মন্ত্র পড়লে রাজাগিরি আর তাঁকে করতে হত না। চন্দ্রজ্যোতিষের তিন স্ত্রী, তাঁর পক্ষে মন্ত্র পড়ে তাদের রূপ বাঁচিয়ে রাখা খুবই সহজ।"

দিল্লীশহরের কথা তোমরা নিশ্চয়ই জানো। তবু বলছি, পুরণো কেল্লা আর বিখ্যাত মসজিদ সম্বন্ধে যে কোনো বই থেকে তোমরা জানতে পারবে, কিন্তু জানতে পারবে না যে কিনারা বাজারে এমন একটা ভাল মেঠায়ের দোকান আছে, যার মেঠাই হচ্ছে পৃথিবীর সেরা। এ-খবর বই-এ পাওয়া যায় না। লিকি না বল্‌লে, আমিই কি জানতাম? আমরা যখন মিষ্টি কিনছিলাম, একটা বেজি দেখলাম পাশের ড্রেণের মধ্যে ইঁদুর ধরবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শহর দেখে আমরা চন্দ্রজ্যোতিষের বাড়ী এলাম। তিনি তখন ফিরে এসেছেন। বেশ নাদুসনুদুস লোকটি, মাথার পাগড়ীতে একখানা মস্তবড় চুনি বসানো। চন্দ্রজ্যোতিষ বেশ ভালো ইংরেজী বলেন। কিন্তু উচ্চারণ ভালো নয়। তিনি স্টেশনকে বলছিলেন, ইষ্টিশন, বক্স্‌কে বলছিলেন বাক্স। ওঁর উচ্চারণ শুনে আমি বোধহয় একটু হেসেছিলাম। তিনি কিন্তু টের পেয়ে বল্‌লেন, "জানেন, আমি ইচ্ছে করলে আপনাদের বেতারে যাঁরা কথা বলেন, তাঁদের মত ইংরেজি বলতে পারি। কিন্তু ইংরেজি এমনিভাবে বলতে আমার খুব মজা লাগে। আপনাদের উর্দ্দনবিশ সাহেবরা যখন উর্দ্দুতে ঘোড়ার উপরে জিন লাগাও না বলে ভুল করে সাহেবের পিঠে জিন লাগাও বলেন তখন ত আমরা হাসি না! বিদেশী ভাষা বলছি, ভুল ত করবই।"

আমি লজ্জিত হয়ে ওঁর কাছে ক্ষমা চাইলাম। এবার খাওয়ার ডাক পড়ল। আমরা নানা অদ্ভুত রকমের মাছ আর মেঠাই খেলাম। এ-বাড়ীতেও দেখলাম, সোণা আর রূপোর বাসনের ছড়াছড়ি। সব খাওয়া হয়ে গেলে, চন্দ্রজ্যোতিষের এক চাকর একটা আমের অাঁটি নিয়ে এসে একটা বেতের ঝুড়িতে রাখল। দেখতে দেখতে ঝুড়ির মধ্যে একটা গাছ গজিয়ে উঠল। গাছ বড় হল, ফুল ফুটল, তারপরে দেখা দিল ফল। আম খেতে শুরু করলাম। একটা চাকর মজার খেলা দেখাল। সে একটা দড়ি শূন্যে ছুঁড়ে দিল। তারপর সেই

দড়ির উপর উঠে দড়িটা ধরে টানতে শুরু করল। খানিকক্ষণ পরে দড়ি আর চাকর কাউকেই দেখা গেল না।

লিকি বললেন, "এই খেলাটা কিন্তু আমি কখনও দেখাতে পারি নি।"

"তার মানে হচ্ছে," চন্দ্রজ্যোতিষ বললেন, "তুমি মন্ত্রটা এখনও ভালো করে উচ্চারণ করতে শেখো নি। 'স্মৃতা' এই কথাটা উচ্চারণ করবার সময় জিভকে কখনও অতটা বার কোরো না। এইখানেই ইওরোপের যাদুকরেরা ভুল করে।"

লিকি কথাটা বহুবার আওড়াতে আওড়াতে শেষে ঠিক উচ্চারণ করলেন। এবার তিনি চন্দ্রজ্যোতিষকে বললেন, "বহু ধন্যবাদ বন্ধু, আমি বাক্সে করে কয়েকটা নতুন যাদুবিদ্যার পুঁথি নিয়ে এসেছি। দেখবে চল!"

আমরা আবার বাগানে ফিরে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি, এক অদ্ভুত ব্যাপার! তোরঙ্গের ডালাটা খোলা। ক্লেমেনটিনা ঘাসের উপর গড়াগড়ি দিচ্ছে।

চন্দ্রজ্যোতিষ বললেন, "এ নিশ্চয়ই আমার চাকর পিয়ারীলালের কাজ! পিয়ারীলাল! পিয়ারীলাল!"

কোথায় পিয়ারীলাল? কোনো সাড়াশব্দ মিলল না। একটা খোলা পুঁথি দেখে লিকি জিজ্ঞেস করলেন, "পিয়ারীলাল কি দেবনাগরী পড়তে পারে?"

"হ্যাঁ, কিন্তু যাদু বিদ্যার কিছুই শেখেনি।" চন্দ্রজ্যোতিষ পুঁথির খোলা পাতাটার উপর চোখ বুলিয়ে বললেন, "এযে

দেখছি মানুষকে ফড়িং করে দেয়ার মন্ত্র! বেটা, হয়ত ভেবেছিল আমাদের সবাইকে ফড়িঙ্ করে দেবে, কিন্তু ওত আর জানতনা, পুঁথির সতেরো পাতার শ্লোকটা সঙ্গে সঙ্গে না পড়লে নিজেই ফড়িঙ হয়ে যাবে। এমনি বেশ শান্তশিষ্ট লোকটা, কিন্তু মাঝে মাঝে মাথায় কি যে দুষ্ট বুদ্ধি চাপে! এখন দেখ দেখি, ওকে আবার মানুষ করে দিতে হবে ত?”

লিকি আর আমরা সবাই এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

চন্দ্রজ্যোতিষ বললেন, “আপনারা ঘাবড়াবেন না। আমি একটা এমন একটা মন্ত্র জানি, যার বলে এক মাইলের মধ্যে যত ফড়িঙ আছে সব উড়িয়ে এখানে এনে হাজির করতে পারি। এক সময় এই মন্ত্র পড়ে পাজি যাদুকরের দল লোকের ক্ষেতের শস্য নষ্ট করে দিত। আমার ঢাকটা নিয়ে এস ত নুর-ই-দুনিয়া!”

এখন এই পরীর নাম হচ্ছে নুর-ই-দুনিয়া; তার মানে হচ্ছে, জগতের সব চেয়ে সুন্দরী মেয়ে। নুর-ই-দুনিয়া ছুটে গিয়ে বাড়ীর ভেতর থেকে একটা বেশ বড় ঢাক নিয়ে এলেন। চন্দ্রজ্যোতিষ সেই ঢাকটার চারিদিকে নেচে নেচে একটা লাল রঙের ছাতার বাঁট্ দিয়ে পেটাতে শুরু করলেন, সঙ্গে সঙ্গে ছড়াও বললেন বই কি। সে ছড়া তোমাদের কাছে বলতে পারি কিনা—একথা আমি লিকিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি অনুমতি দিয়েছেন। কেননা, ছড়া জানলেই ত শুধু

হবেনা, নাচও জানা চাই। ঢাকের বাদ্যির তালে তালে পা না ফেলতে পারলে ও ছড়া কোনো কাজেই আসবে না। ছড়াটা শোনো ঃ

টাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্…
গঙ্গা ফড়িঙ আয়না তোরা ছুটে
আয়না তোরা নেচে কুঁদে দলে দলে জুটে
প্রজাপতি মৌমাছিরা
তোরা সবাই দূরে দাঁড়া।
গঙ্গা ফড়িঙ তা-ধিন, ধিন
এলরে সব ছুটে।
পথ ছেড়ে দে,
পথ ছেড়ে দে
এল ওরা জুটে।
টাক ডুমা ডুম্ ডুম্
তোদের চোখে লাগুক ঘুম।

লিকি মন্ত্র পড়ে একটা গণ্ডী এঁকে দিলেন।

নুর-ই-দুনিয়া এবার রামধনু রঙের পাখামেলে আমাদের মাথার উপর উড়তে লাগলেন! লিকিকে জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, "উনি প্রজাপতি আর মৌমাছিরা যাতে উড়ে এসে গণ্ডীর ভেতরে না পড়ে তারই ব্যবস্থা করছেন।" বাতাসে এবার গুণ গুণ শব্দ শোনা গেল, মনে হল অনেকগুলো এরোপ্লেন যেন ধেয়ে আসছে। কয়েকটা প্রজাপতি,

মৌমাছি আর প্রকাণ্ড গণ্ডারের মত শিংওলা একটা গুবরে পোকা এসে গণ্ডীর মধ্যে পড়েই মরে গেল। এখনও নুর-ই-দুনিয়া মন্ত্রটা পুরোপুরি আওড়াতে পারেন নি বলেই এই কাণ্ড হল। খানিকক্ষণ পরে শুধু এল পালে পালে ফড়িঙ। দেখতে দেখতে ফড়িঙের ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশই অন্ধকার হয়ে এল। দু-একটা পাখী উড়ে এসে ফড়িঙ ধরতে শুরু করল। চন্দ্রজ্যোতিষ বললেন, "না, পাখীগুলো ত বড় জ্বালাতন করছে! আমার অতিথি ফড়িঙদের ওরা খেয়ে ফেলবে, এ হতেই পারে না। ওরা হয়ত পিয়ারীলালকেই টপ করে গিলে ফেলবে।" নুর ততক্ষণে মন্ত্রপড়ে শূন্য থেকে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি তার দিকে ফিরে বললেন, "নুর, আর একবার তোমাকে শূন্যে উঠতে হচ্চে, পাখী তাড়াতে হবে।" নুর আর একবার বোঁ করে উড়ে গেলেন আমাদের মাথার উপর। সঙ্গে সঙ্গে পাখীগুলোও ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। এবার নীচে গণ্ডির ভেতরে তাকিয়ে দেখলাম, কত রকমের ফড়িঙ যে সেখানে নেচে বেড়াচ্ছে, তাদের কুলুজী আওড়ানো আমার কর্ম নয়। কোনোটা একেবারে ক্ষুদে, চোখেই মালুম হয় না, কোনোটা আবার ধাড়ি গলদা চিঙড়ির মত। তাদের রঙই বা কত রকমের!

এখন চারদিক এত অন্ধকার হয়ে এসেছিল যে, চোখে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। চন্দ্রজ্যোতিষের চাকর বাড়ীর ভেতর থেকে আলো নিয়ে এল। সে আবার যে সে আলো নয়,

মস্তবড় একখানা হীরে, তার ভেতর থেকে ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে আলো। তার কাছে হাজার পাওয়ারের বিজলী আলো কোথায় লাগে! ফড়িঙের দল তখনও গণ্ডিতে উড়ে আসছে, নাচছে, গান গাইছে! সে কি গান! আমরা ত ওদের গানের তানে কানেই কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না। লিকি একটা বই খুলে মন্ত্র পড়তেই তাদের গান বন্ধ হয়ে গেল।

"পিয়ারীলালকে দেখতে পাচ্ছ?" লিকি চন্দ্রজ্যোতিষকে জিজ্ঞেস করলেন।

"না। আমি ভাবছি, যেগুলো অদ্ভুত ধরণের, ওদের উপর মন্ত্র পড়ে দেখব কিনা। কিন্তু এখন মুস্কিল হয়েছে কি জানো, একসঙ্গে সাতটার বেশির উপরে এ মন্ত্রে ফল হবে না। অথচ অদ্ভুত ফড়িঙ গুণতিতে হবে প্রায় এক কোটি। কতদিন বসে পিয়ারীলালকে খুঁজে বার করব!"

"ও নিয়ে অত ভাবছ কেন?" লিকি বললেন, "আবদুল মক্কার এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ও ঠিক ফড়িঙের দল থেকে পিয়ারীলালকে খুঁজে বার করবে। ও বলে, মন্ত্রবলে যে-সব মানুষ পশু, পাখী কি ফড়িঙ হয়ে যায়, তাদের নাকি আসলগুলোর মত দেখতে হয় না। তাদের দেখতে দেখায় মিকি মাউসের মত। কিন্তু এখনো আসছে না কেন? ওর আসবার কথা ছিল পাঁচ মিনিট আগে। এবার যাদু-আঙটি ঘষে ওকে ডাকতে হল দেখছি। কিন্তু এই আঙটি-ঘষা আমি মোটেও ভালবাসি নে। একটা শ্লেটের উপর পেন্সিল দিয়ে

জোরে দাগ টেনে গেলে যেমনি বিশ্রী লাগে কানে, ঠিক তেমনি লাগে! জিন হয়ত তখন আরশীর সমুখে দিব্যি পরিপাটি করে পাগড়ী বাঁধছে। এমন সময় সেই বিশ্রী শব্দটি তার কানে গিয়ে ঢুকল। পাগড়ীটা আর ভালো করে বাঁধা হল না। ছুটতে হল সাতসমুদ্দুর তেরো নদীর পারে মনিবের কাছে। আলাদিনের সময় অমনি করে আঙটি আর প্রদীপ ঘষে জিনদের তাদের মনিবরা নিয়ে আসত। কিন্তু ঐ বিশ্রী শব্দে আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের জিনের নাকি এমন মাথা ধরেছিল, আজ হাজার হাজার বছর ধরেও তা সারে নি। ভিয়েনার একজন ভদ্রমহিলা আমাকে সেদিন বলছিলেন, তাঁর কাছেই প্রদীপটা আছে কিনা! তিনি ওর কাজের এখন সময় ঠিক করে দিয়েছেন। অফিসের কেরাণীদের মত এখন সে ক'ঘণ্টা কাজ করে বাড়ী গিয়ে দিব্যি আরামে বিশ্রাম করে। অ্যাসপিরিন খেয়ে খেয়ে মাথাধরাও নাকি প্রায় সেরে এসেছে।"

এবার আবত্নল মক্কার মাটি ফুঁড়ে উঠে এল। সে মাটি অবধি নুয়ে লিকিকে লম্বা লম্বা কথায় বলতে যাচ্ছিল, কেন তার দেরী হল। লিকি কিন্তু তাকে সে সুযোগ না দিয়ে বললেন, "এই ফড়িঙের পালের ভেতর থেকে পিয়ারীলালকে খুঁজে বার কর।"

তু' এক মিনিট পরেই আবত্নল মক্কার একটা মোটাসোটা বাদামী রঙের ফড়িঙকে খুঁজে বার করল। চন্দ্রজ্যোতিষ

এবার ঘটা করে মন্ত্র পড়ে তার গায়ে জল ছিটিয়ে দিলেন। প্রথমে দেখা গেল ফড়িঙটা ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে, ওর গায়ের বাদামী চামড়া ফেটে গেছে। তারপর তার গা দিয়ে বেরুল ক্ষুদে ক্ষুদে দু হাত আর পা। ওর মাথাটায় চুল গজাতে লাগল, তারপর কপাল, নাক, মুখ। দেখতে দেখতে সেই ক্ষুদে মানুষটা হয়ে উঠল মস্তবড় একটা লোক। এই পিয়ারী-লাল! মুখ তার ভয়ে একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে! হয়ত, ভাবছিল মনিব বোধহয় আবার তাকে ওরাংওটাঙ বা ঐরকম একটা কিছু করে দেবেন। এখন একটা মজার কথা তোমাদের বলব। ফড়িঙের পেছন দিকটা হয়ে গেল পিয়ারী-লালের সামনের দিক, আর সামনেটা পেছনের দিক। আমি আমার একজন প্রাণীতত্ত্ববিদ বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "এটা কি রকম করে হল মশাই।" তিনি বললেন, "ঠিকই হয়েছে। ফড়িঙের কলজেটা মানুষের মত সামনে থাকে না, থাকে পিঠের দিকে, ওর সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রই অমনি তৈরী। ওইটেই নাকি ওর সামনের দিক। তাহলে ত বড় মুস্কিল হল। কোনো পণ্ডিত একদিন হয়ত বলে বসবেন, আমাদের সামনের দিকটাই আসলে হচ্ছে পেছন দিক, আর পেছনটা হচ্ছে··· কি বলত ?

পিয়ারীলাল কিন্তু এখনো মাটিতে ফড়িঙদের মত ডিগবাজি খাচ্ছিল, উঠে দাঁড়ায় নি। এবার চন্দ্রজ্যোতিষ আর একটা মন্ত্র পড়তেই সে উঠে দাঁড়াল। দেখলাম ওর

মুখখানার অর্দ্ধেকটা লাল, আর অর্দ্ধেকটা সবুজ, চুলগুলো খুব ঘন বেগুনি! "এই রঙ এক সপ্তাহ থাকবে। কাল আর বেচারাকে রাস্তায় বেরুতে হবে না।" চন্দ্রজ্যোতিষ হেসে বললেন।

চন্দ্রজ্যোতিষ আবার ঢাক পেটাতে পেটাতে নেচে নেচে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়তে লাগলেন। এক মুহূর্ত্তেই ফড়িঙ গুলো মিলিয়ে গেল।

সূর্য ডুবেছে। রাত হয়ে আসছে।

এবার আমরা রওনা হব। বইগুলো তোরঙে রাখা হল, ক্লেমেনটিনা এসে তোরঙটাকে জড়িয়ে ধরে বসল। পম্পির অগ্নিকুণ্ডটা এতক্ষণে প্রায় নিভে এসেছিল, এবার গনগনে রাঙা কয়লা এনে তাতে দেয়া হল। আমরা সবাই উঠে বসলাম।

লিকি বললেন, "এবার চলুন পৃথিবীটা চক্কোর দিয়ে বাড়ী যাই। রাতে গাল্‌চে ছোটে ভাল। কোথায় যাবেন, আমেরিকায়?"

বললাম, "দক্ষিণ বা মধ্য আমেরিকা যদি হয় ত যেতে পারি। উত্তর আমেরিকায় আর দুমাস পরে আমাকে এমনিই যেতে হবে। আর সিনেমায় এত ছবি দেখেছি যে..."

চন্দ্রজ্যোতিষ আর তাঁর স্ত্রীদের কাছে আমরা বিদায় নিলাম। নুর-ই-দুনিয়া বললেন, তাঁকে যদি আমরা ওয়াক-ওয়াক দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে যাই ত বড় ভাল হয়। তাঁর এক

বোন আছে সেখানে। ফেরবার সময় উড়েই ফিরবেন, কিন্তু বিকেলের এই খাটাখাটুনির পর উড়ে যেতে তাঁর ভালো লাগছে না। তাই গাল্‌চেয় চড়ে তিনি যেতে চান। লিকি রাজী হলেন। নুর-ই-তুনিয়া এসে বসলেন আবতুলের পাশে। গাল্‌চে এবার উড়ে চলল। আকাশে খোকা চাঁদ সবে উঠেছে, আমরা ঠিক ওরই কাছ দিয়ে চললাম। কিছুক্ষণ পরেই চোখে পড়ল, কালপুরুষ তার ভীষণ কুকুর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর তারই সমুখে একটা ছোট্ট তারার নদী বয়ে চলেছে। অগ্যস্ত কুকুরটার লেজের পেছনে উঁকিঝুঁকি মারছে। তু'এক সেকেণ্ডের ভেতরেই আমরা ভারতমহাসাগরের উপর দিয়ে চললাম। কি সুন্দর যে দেখাচ্ছিল চাঁদের আলোয়, কি বলবো। এবার নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ ছাড়িয়ে মালয়ে এসে পড়লাম। নুর-ই-তুনিয়া আবতুল মক্কারের সঙ্গে জিনদের ভাষায় কত কথা বলে চলেছেন। কি বলছিলেন কে জানে! লিকিও নাকি জিনদের সব কথা বুঝতে পারেন না। ওদের কথা থেকে এইটুকু লিকি বুঝতে পারলেন যে, আবতুল মক্কারের এক পিসির গল্প ওরা করছে। পিসির বুড়ো বয়সে কয়েকটা দাঁত উঠেছে। আর চোখের তেজও নাকি হঠাৎ এত বেড়ে গেছে যে, এখন তাকে কালো রঙের চসমা এঁটে থাকতে হয়। চসমা খুললেই মুস্কিল, যার দিকে তাকাবেন একেবারে তার পেটের নাড়িভুঁড়ি পর্য্যন্ত দেখা যাবে যে! তোমরা নিশ্চয়ই এক্স-রের কথা জানো, ডাক্তাররা পেটের ভেতর কিছু হলে

এই আলো ফেলে খুঁজে দেখেন কি হয়েছে। আবদুল নক্কারের বুড়ী পিসিমারও চোখের দৃষ্টি হয়েছিল ঠিক এক্স-রের মত। তা এতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই। জিনদের বুড়ো হলে আমাদের মত তাদের দাঁত পড়ে না বা চোখে কম দেখে না।

কয়েকটা সমুদ্র পেরিয়ে এবার আমরা একটা আগ্নেয়-গিরির কাছে এসে পড়লাম। আগুনের আঁচে সারা আকাশটাই লাল হয়ে আছে। লিকি বললেন, "আমরা জাভায় এসে পড়েছি, এখানে বহু আগ্নেয়গিরি আছে।" এবার গাল্‌চে বাঁ দিকে বেঁকতেই আমরা মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জের উপর এসে পড়লাম। আমি জানতাম, পুরণো দিনে এই দ্বীপের নাম ছিল ওয়াক-ওয়াক। এই ওয়াক-ওয়াক দ্বীপের কথা আমি আরোব্যপন্যাসে পড়েছি। তোমরাও পড়েছ নিশ্চয়ই। না পড়ে থাক, বসোরার হাসানের গল্পটা পড়ো। নুর-ই-তুনিয়া এবার আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তোমরা কেউ কেউ নিশ্চয়ই উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পুকুরে সাঁতার কাটতে জানো। নুর-ই-তুনিয়া ঠিক অমনি করে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। লিকি বললেন, "এবার চলুন আমেরিকার দিকে। আমাদের যাতু-গাল্‌চে এবার দক্ষিণে চলতে শুরু করল। অষ্ট্রেলিয়ার উপর দিয়ে চললাম। এই পথেই ডাক নিয়ে উড়ো জাহাজ যাওয়া আসা করে, কিন্তু আমরা যাচ্ছিলাম উড়ো জাহাজের থেকে তু'শো গুণ বেশি

নুর-ই দুনিয়া ঝাঁপ দিলেন—৯২

হাজার হাজার পেঙ্গুইন জটলা করছে—পৃঃ ৯৫

জোরে। নীচে শহরগুলো সব ঘুমন্ত, আলোর এক চিলতে কোথাও নেই। আমাদের উপরে জ্বলছে তারার দল। তুধের মত শাদা ছায়াপথ বিছিয়ে আছে আকাশের এখানে ওখানে। এবার আমরা অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে সমুদ্রের উপর। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সূর্য দেখা যাচ্ছে। আমাদের নীচে মেঘের ফাটল দিয়ে দেখা গেল সমুদ্র, সেখানে ভাসছে বড় বড় বরফের পাহাড়। "আমার কিন্তু পেঙ্গুইন দেখতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে," লিকিকে বললাম।

"বেশ ত! কিন্তু গরম জামা কাপড় কিছু পরতে হবে। অ্যানটার্কটিক সাগরে রোদ থাকলেও বড় হাওয়া। একেবারে গায়ের রক্ত জমিয়ে বরফ করে দেয়। ক্লেমেনটিনা, তোরঙটা খোল ত!" ক্লেমেনটিনা প্যাঁচ খুলে নিতেই লিকি বাক্স থেকে বার করলেন গরম জামা কাপড়! আমরা সেগুলো পরে তৈরী হয়ে নিলাম। এবার গালচে নীচে নামতে শুরু করল। একটা জায়গায় এসে লিকি বললেন, "এইখানেই পেঙ্গুইনদের শহর। লিড বা ব্রিষ্টলের থেকে এর বাসিন্দে মোটেই কম হবে না। আপনি ভাবছেন, আমি এত জানলাম কি করে। এক সময়ে আমি এখানে ছিলাম, তা প্রায় বছর তিনেক ত বটেই। না, না, মানুষ নয়, পেঙ্গুইন হয়ে। একটা পাজি যাতুকর আমার উপর ভারী চটেছিল। একদিন বাথরুমে স্নান করতে গিয়ে যেই যাতু-আঙটিটা খুলে রেখেছি, অমনি মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। খানিকক্ষণ পরে তাকিয়ে দেখি, কোথায়

বাথরুম, আমি আনটার্কটিকে পেঙ্গুইন হয়ে সাঁতরে সাঁতরে মাছ ধরছি! বড় দুঃখ হল, কেন আঙটিটা খুলে রেখেছিলাম! কি আর করবো, ঐ খানেই জীবন কাটাতে হবে, একটা পেঙ্গুইন মেয়েকে বিয়ে করে ফেললাম। দু'টি ছেলেমেয়ে হল। একদিন আমার বৌকে একটা সীল এসে টুপ করে খেয়ে ফেলল। ক'দিন ত খুব কান্নাকাটি করলাম। শেষে ভাবলাম, না, পেঙ্গুইনের জীবন আর নয়, এবার মানুষ হতে চেষ্টা করব। সমুদ্রের ধারে নুড়ি কুড়িয়ে একটা ঢিবি করলাম, কিন্তু মন্ত্র, আর পড়তে পারি না। তাই একটা যাদু-নাচ নাচলাম তারই চার পাশে। তিন দিন তিন রাত নাচবার পর হলাম মানুষ।"

"আর সেই পাজি যাদুকরটার কি হল?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "ওকে এখন আমি একটা মমীর মধ্যে পুরে লণ্ডনের যাদুঘরে বন্দী করে রেখেছি। রাতে একটু ঠাণ্ডা লাগে তাছাড়া বিশেষ কিছু কষ্ট নেই। ওকে ইচ্ছে করলে আমি বোতলে পুরে আটলাণ্টিকে ফেলে দিতে পারতুম, না হয়ত আরবের সেই দু'টো দুষ্ট দৈত্য হারুত আর মারুতের মত একটা কুয়োর ভেতরে মাথা নীচে পা ওপরে দিয়ে ঝুলিয়ে রাখতে পারতুম, কিন্তু আমার আবার মনটা বড় নরম, কাউকে বেশি কষ্ট দেয়া আমি পছন্দ করিনে।"

আমরা এবার পেঙ্গুইনদের শহরে এসে নামলাম। বরফ পাটির মত বিছিয়ে আছে। তারই উপর এখানে ওখানে

পেঙ্গুইনদের পাথরের বাসা। মেয়েরা বাসায় ছানা কোলে নিয়ে বসে আছে, পুরুষরা বেরিয়েছে মাছের খোঁজে সমুদ্রে। সমুদ্রের ধারে হাজার হাজার পেঙ্গুইন জটলা করছে। ওদের দেখে মনে হচ্ছে যেন, মোটাসোটা কতগুলো লোক সান্ধ্য-পোষাকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ কেউ বা এক এক খণ্ড 'ডাইভিং বোর্ডের' মত বরফের উপর দাঁড়িয়ে, একজন আর একজনকে ধাক্কা মেরে সমুদ্রে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করছে। এডমিরাল বার্ড বলে এক ভদ্রলোক এই আনটার্কটিকে এসে এই পেঙ্গুইন শহর নিয়ে একখানা ছবি তুলেছিলেন, সেই ছবিখানা কখনও যদি এদিকে আসে ত দেখো।

পেঙ্গুইন দ্বীপ দেখা হয়ে গেল। এবার আমরা চললাম দক্ষিণ মেরুর উপর দিয়ে। একটা জীবনের সাড়া শব্দ নেই। শুধু এখানে ওখানে বড় বড় পাহাড় বরফের চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল সমুদ্র। সমুদ্রে খানকয়েক জাহাজ দেখা গেল। এই জাহাজগুলো কেপহর্ণ ঘুরে টিয়েরা ডেল ফিউগো আর দক্ষিণ আমেরিকায় যায়। আর্জেনটিনার উপর দিয়ে ব্রেজিলে এসে পৌঁছলাম। বেশ গরম লাগছিল। গরম জামা কাপড় খুলে ফেলে সিল্কের সার্ট আর সর্ট পরলাম। তাকিয়ে দেখলাম—সবুজ চাদর কে যেন বিছিয়ে রেখেছে নীচে। তারপরেই শুরু হল আমাজন নদী, ইংলিশ চ্যানেলের মতই প্রায় বড় হবে। কিন্তু স্রোত খুব, স্রোতের টানে বড় বড় গাছ ভেসে আসছিল দেখলাম।

কয়েকটা পাহাড় পেরিয়ে আমরা আবার সমুদ্রে পড়লাম। ঘড়িতে এখন সাড়ে তিনটে।

"এবার চলুন আগ্নেয়গিরি দেখে আসি, কিন্তু তার আগে আপনাকে হাতে একটা কবচ পরতে হবে," এই বলে লিকি একটা কবচ আমার হাতে দিলেন। আমাদের গাল্‌চে থামল একটা দ্বীপে। বোধহয় মার্টিনিক হবে। সেখানে দেখলাম একটা আগ্নেয়গিরি হুঁস হুঁস করে ধোঁয়া ছাড়ছে আকাশে! কবচটা হাতে বেঁধে একজোড়া অ্যাসবেস্টসের বুট পরে নিলাম। গাল্‌চে যে টীলাটার উপর থেমেছিল তারই পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল লাভার নদী। জায়গাটা কি বিশ্রী, একটা গাছপালা নেই, কালো কালো দাঁত বার করা পাথর আর পাথর! তাও পা রাখা যায় না, এত গরম। সেগুলো ভীষণ শব্দ করে মাঝে মাঝে ধসে পড়ছে। কিন্তু পম্পি ড্রাগন কিনা, ওর কাছে জায়গাটা ভালোই লাগল। সে অগ্নিকুণ্ড থেকে টুক্ করে লাফিয়ে একেবারে পড়বি ত পড় আমারই গায়ের উপর। ভাগ্যিস একটু পাশে সরে গিয়েছিলাম, নইলে কি যে হত বলা যায় না। ড্রাগনের গায়ে ধাক্কা লাগলে আমার কবচে কোনো ফল হত কিনা কে জানে। হয়ত খানিকটা ছাই হয়ে উড়ে গিয়ে লাভার নদীতে পড়তাম, তোমরাও আর গল্প শুনতে পেতে না। যাকগে, বেঁচে ত গেলাম, কিন্তু হাঁটুতে ভারী চোট লাগল। এদিকে শ্রীমান পম্পি তখন লাভার নদীতে পড়ে হুটোপুটি খাচ্ছেন। আমি কাতরাতে কাতরাতে ডাকলাম

লকিকে। তিনি এসে এক মিনিটে একটা মন্ত্র পড়ে পায়ের ব্যথা সারিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, "অত্যন্ত দুঃখিত, আমি গন্ধক কুড়োচ্ছিলাম। যাদু করতে হলে কারখানার তৈরী গন্ধকে কোনো ফল হয় না। তাই আগ্নেয়গিরি থেকে দু'চার টুকরো গন্ধক কুড়িয়ে নিলাম। এখানে আরও অনেক আগ্নেয়গিরি আছে, কিন্তু স্পেনের লোকেরা যখন এখানে এল, তারা অনেকগুলো আগ্নেয়গিরিকে মন্ত্র পড়ে শান্ত করে দিয়েছিল। কিন্তু শান্ত হলে কি হবে, এখনও তারা হাঁচলে বা কাসলে মাঝে মাঝে আগুন বেরোয়। কিন্তু ওদের গন্ধক যাদুকরদের কোনো কাজেই আসে না। এটাকে কিন্তু ওরা শান্ত করতে পারে নি। এই পম্পি, কি হচ্ছে? উঠে এস।" পম্পি তখন একটা লাভার ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে চলেছে, ডুবে ডুবে গনগনে আগুনের সরবৎ খাচ্ছে, সেকি আর লিকির কথা শোনে!

লিকি এবার আবদুল মক্কারকে ডেকে বললেন, "হে আবদুল মক্কার, তোমার অনুরোধে আমি এই অগ্নিখাদক ড্রাগনকে আমার যাত্রাসহচর করেছিলাম। শাস্ত্রে লিখিত আছে, যে সদুপদেশ দেয় পুষ্পের মাল্য তার প্রাপ্য, কিন্তু অসদুপদেশ দানকারীর শাস্তি কারাগার। কিন্তু তোমার উপর সে আদেশ আমি দেব না। তুমি অবিলম্বে ঝম্প প্রদান করতঃ পম্পিকে শৃঙ্খলিত করে আনয়ন কর। আমরা ততক্ষণে আন্দ্রোস দ্বীপ প্রদক্ষিণ করে আসি।"

আবদুল মক্কার লিকিকে সেলাম জানিয়ে সেই লাভার

নদীর ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমরা গালচেয় চড়ে চললাম আন্দ্রোস দ্বীপে। আন্দ্রোস বড় সুন্দর দ্বীপ। সমুদ্র এখানে বড় শান্ত। আমরা সমুদ্রের ধারে বালির উপর বসে পড়লাম সূর্য আকাশে, আমাদের গায়ে কেমন মিঠে রোদ লাগছে ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট ছোট মাছ খেলছে সমুদ্রের ধারে। দূরে প্রবালের পাহাড়ের উপর সূর্যের কিরণ পড়ে ঝলমল করছে। আমরা এখানে বসে চা খাওয়া সেরে নিলাম। খানিকক্ষণ পরে পম্পিকে নিয়ে আবদুল মক্কার এসে হাজির হল পম্পির আষ্টেপৃষ্ঠে একটা অদ্ভুত শেকল জড়ানো। বেচারীর মুখখানা কাঁদো কাঁদো। গালচেয় উঠে বসলাম। সূর্য যখন ডোবে ডোবে তখন এলাম বিস্কে উপসাগরে। এবার গরম জামা পরে নিলাম, এখুনি লণ্ডনে পৌঁছে যাব।

আমরা লিকির ঘরে দেয়াল ফুটো করে এসে হাজির হলাম। আমি আগেই বলেছি ঘণ্টায় নব্বুই মাইল জোরে দেয়াল ফুটো করে ঘরে ঢোকা আমি পছন্দ করিনে। যদিও জানি, কোনো ব্যথা লাগবে না। তোমরা যদি কখনও যাদু-গালচেয় চড়বার সুযোগ পাও, রওনা হওয়ার সময় আর ফেরবার মুখে চোখ বুঁজে থেকো।

ঘরে এসে দেখলাম, সব ঠিক তেমনি আছে, হঠাৎ বাইরে কি একটা শব্দ হল। দরজা খুলে তাকিয়ে দেখি, একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে, তার নাকটা একটা গোলাপী সুতো দিয়ে দোরের হাতলের সঙ্গে বাঁধা। কত টানাটানি করছে,
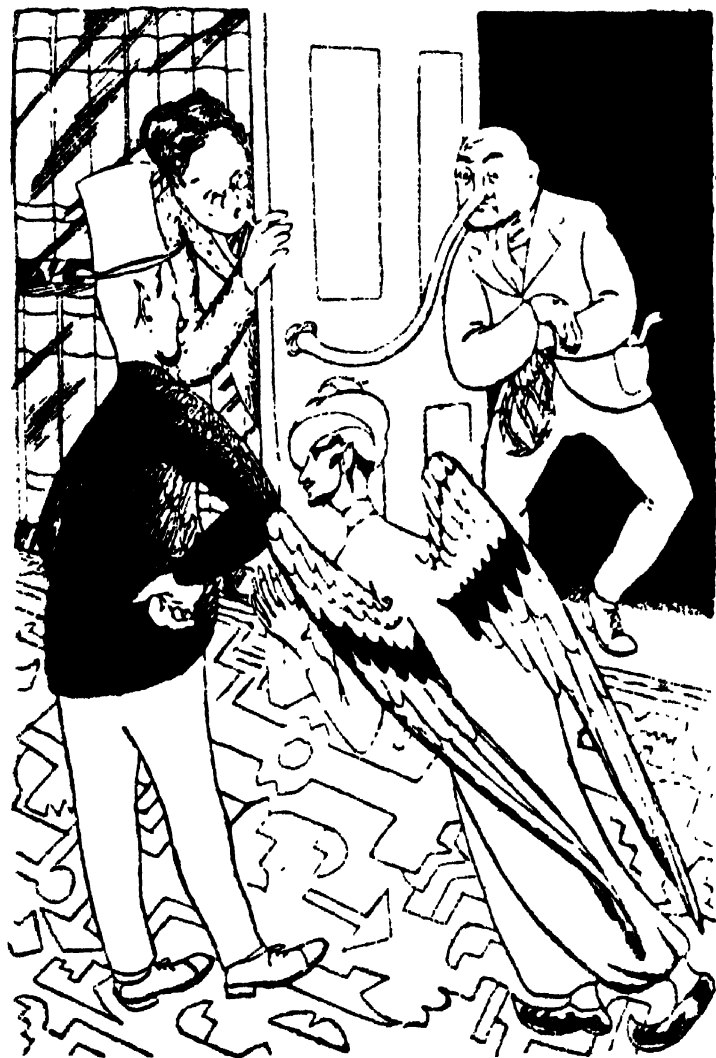
রবারের মত লম্বা হয়েছে তার নাক—পৃঃ ৯৯

সোনালী মাছটি টুপি তুলে লিকিকে নমস্কার জানাচ্ছে—পৃঃ ১০৩

কিছুতেই খুলতে পারছে না। রবারের মত লম্বা হয়ে গেছে তার নাক।

জিন বলল, "হে যাতুকরশ্রেষ্ঠ, আমি কি জীবন্ত অবস্থায় ওর গাত্রচর্ম উৎপাটন করে ফেলব, না, ঐ তুরাত্মার সম্মুখে ওর নিজেরই লিভার উৎপাটন করে আপনার ভোজনের জন্য ভর্জিত করে দেব। তস্করের ভর্জিত লিভার টারবট্ মাছ অপেক্ষাও সুস্বাতু।"

"হে আবতুল মক্কার, লণ্ডন শহরে এ-বিধি আজ আর প্রচলিত নেই", লিকি বললেন, "সুতরাং ঐ তুইটি পন্থার একটিও আমরা অবলম্বন করব না।" এবার চোরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ভাগ্য ভালো যে এক সপ্তাহের জন্য আমরা বাইরে যাই নি। তাহলে এই দোরের সঙ্গে বাঁধা নাক নিয়ে এক সপ্তাহ বসে থাকতে হত। ভাবছ, তোমার সাঙাৎরা খুলে দিত। কিন্তু কুড়ুল মেরে উড়িয়ে দেয়া ছাড়া ও নাক কেউ খুলতে পারত না। ধর, আমি যদি আর না ফিরতাম, কি হত? সেই গ্রীক রূপকথার থিসিউসের মত হত। তারা যাতু-আঠায় আজ তিন হাজার বছর ধরে আটকে আছে। যাহোক, তোমার ভয় নেই, আমি তোমাকে ছেড়ে দেব। কিন্তু আর চুরি তোমাকে করতে দেব না। যে বাড়ীতেই চুরি করতে ঢুকবে সেখানে দরজার হাতলের সঙ্গে এমন ভাবে নাক আটকে যাবে যে কুড়ুল মেরে খোলা ছাড়া উপায়ই থাকবে না। নাক যদি হারাতে না চাও, তাহলে ঢুকো না

কোনো বাড়ীতে। এখন পালাও।” এই বলে তিনি দড়িটা খুলে দিতেই চোরটা এত তাড়াতাড়ি ছুটে পালিয়ে গেল, আমার মনে হল পড়ে গিয়ে সিঁড়িতে বুঝি ঘাড়টাই মট করে ভেঙে যায়।

লিকি সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, “লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে এখন দুঃখ হচ্ছে। ও যে দৌড়ে হাণ্ড্রেড-ইয়ার্ডস চ্যাম্পিয়ন হতে পারে ওর বেঁটে আর মোটা পা দেখে আমার মনেই হয় নি। তাহলে পম্পিকে ওর পেছনে লেলিয়ে দিয়ে একটু মজা দেখা যেত। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমাকে এখুনি আমার বন্ধু সয়তানের সঙ্গে দেখা করতে হবে। কাল আবার একটা সাসাবোনাসকে সাজা দিতে হবে কিনা। সে কি আপনি সাসাবোনাস কাকে বলে জানেন না? এক সময় লোকে এসব জানত। আজকাল স্কুল কলেজে পৃথিবীর প্রাণীর নাম শেখায়, কিন্তু তার বাইরে তারা জানেই না, শেখাবে কোথা থেকে। সাসাবোনাস হচ্ছে একরকম দৈত্য, যারা বনের গাছে গাছে, ডাল ধরে ওত পেতে বসে থাকে। কোনো নিগ্রো গাছের তলা দিয়ে গেলে আর রক্ষে নেই। দু-পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে তার গলা টিপে মেরেই ফেলবে। সাদা মানুষরা ওদের বিশ্বাস করে না কিনা, তাই তাদের কিছু বলে না। আমার সয়তান বন্ধুটি এখুনি এসে পড়বে, যদিও সে বেশ সভ্যভব্য সয়তান, তবু আপনি তাকে দেখে হয়ত আঁতকে উঠবেন। তাহলে বিদায় বন্ধু! গাল্‌চেয় চেপে বসুন এবার।”

আমি বললাম, "ধন্যবাদ, কিন্তু এবার আমি বাসেই ফিরব। এতক্ষণ যাদু-গাল্‌চেয় চড়বার পর বাসে চড়াটাই নতুন বলে মনে হবে। খুব আনন্দ পেলাম আপনার সঙ্গে বেড়িয়ে। সোমবার থেকে আবার নতুন উৎসাহে কাজ করতে পারব।"

সোমবার থেকে আবার নিজের কাজে মন দিলাম। এও লিকির মতই অদ্ভুত কাজ! আমি অঙ্ক কষে বার করি কি করে নতুন ধরণের ফুল আর বেড়াল তৈরী করা যায়। তোমরা আর একটু বড় হলে আমি তোমাদের একদিন সে-সব অঙ্ক কি করে কষতে হয় দেখিয়ে দেব।

লিকির বাড়ীতে ভোজ

উনিশ'শ তিরিশ সালের ডিসেম্বরে লিকির সঙ্গে সেই যে ভারতবর্ষ আর উত্তর আমেরিকা ঘুরে এসেছিলাম, তারপরে আর তাঁর দেখা পাই নি। তা প্রায় তিন মাস হল। তাঁর বাড়ীতে একটা টেলিফোনও নেই যে, ফোন করে জানব তিনি কেমন আছেন। এরই মধ্যে দু' দুবার তাঁর বাড়ীও ঘুরে এসেছি। প্রথমবার গিয়ে দেখি দরজার সামনে একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে তাতে লেখা ঃ

নোয়া গো টু বেড
নকল পায়ের নখ বিক্রেতা
খুচরা বিক্রয় নাই।

পড়ে ত হেসেই বাঁচি নে। কারো আবার নাম থাকে নাকি নোয়া গো টু বেড? গো টু বেড মানে ত বিছানায় যাও। নকল্ পায়ের নখ বিক্রি হয় বলেও কখনও জানতুম না। অবশ্য, হলে ভালোই হত। ট্রামে যা ভিড়, রোজই লোকের পায়ের চাপে জুতোর নীচে পায়ের নখ থেঁতলে যাচ্ছে। এই ত আমারই গেছে চারটে। আমি চারটে নকল নখ পেলেই কিনি। কিন্তু সাইনবোর্ডে লেখা আছে খুচরো বিক্রি করবে না, কিনতে হলে একসঙ্গে একশ' ডজন নিতে

হবে। বারে এতগুলো নখ দিয়ে একটা লোক কি করবে? যাক গে, ভাবলাম একশ' ডজন নকল নখই কিনে নিয়ে যাব। ওমা, দেখি নীচে একটা কাগজে কালি দিয়ে লেখা— সামনের বুধবার পর্যন্ত দোকান বন্ধ। গো টু বেড মশাই বোধ হয় বিছানায় শুয়ে আরাম করছেন। একটা চিঠির বাক্স পর্যন্ত দরজায় নেই যে, দু' ছত্র লিখে ফেলে দিয়ে আসব। পরের বার গিয়ে দেখি, সাইনবোর্ড মিলিয়ে গেছে, যেখানে দরজাটা ছিল সেখানে সাদা দেয়াল উঠেছে। তারপরে আর ওদিকে যাই নি। কি করতে যাব বল?

মার্চ মাসের শেষে একদিন রাতে শোয়ার আগে বাথরুমে প্রকাণ্ড টবটায় স্নান করছিলাম। কল দিয়ে ঝরঝর করে গরম জল পড়ছিল গায়ে। সারাদিনের খাটুনির পর আরামও লাগছিল। হঠাৎ দেখি, কলের জলের সঙ্গে একটা সোনালী মাছ টুপ করে একেবারে আমার গায়ের উপর পড়ল। এখন সচরাচর যে সব সোনালী মাছ তোমরা দেখতে পাও, গরম জল গায়ে লাগলে তারা তখ্খুনি মারা যায়। আশ্চর্য হলাম অতখানি গরম জল সাঁতরে কি করে মাছটা হাজির হল! আবার তাকিয়ে দেখি, যে সে মাছ নয়! এক মস্ত লম্বা টুপি তার মাথায়। টুপি খুলে নমস্কার জানিয়ে সে বলল, "শুভ সন্ধ্যা, মিঃ হ্যালডেইন, আমি মিঃ লিকির কাছ থেকে খবর নিয়ে আসছি। আপনি শনিবারে তাঁর বাড়ীতে বিকেল চারটেয় চা খেতে আসতে পারবেন

কি না তিনি জানতে চেয়েছেন। অদ্ভুত অদ্ভুত পোষাক পরে সবাই পার্টিতে আসবেন। পোষাকের জন্য ভাবনা নেই, তিনিই পোষাক জোগাবেন।”

আমি বললাম, “এক মিনিট দেরী কর। আমার যাদু-ডায়েরীটা খুলে সময়টা লিখে রাখি। কিন্তু সাবানগোলা গরম জলে বোধ হয় তোমার কষ্ট হচ্ছে। আমি তোমাকে ঠাণ্ডা জলের টবে ছেড়ে দিচ্ছি, তুমি ততক্ষণ একটু ঠাণ্ডা হয়ে নাও।”

“আপনার ব্যস্ত হবার দরকার নেই”, সোনালী মাছটি হেসে বলল, “আমি সাবান আর গরম জলই বেশি পছন্দ করি। আমি ত সাধারণ সোনালী মাছ নই। আমি আগে নিউজিল্যাণ্ডে এক গরম ঝরণায় থাকতাম। সেখানে লোকে মজা দেখতে মাঝে মাঝে সাবান ছুড়ে ফেলত। সেই সাবান এক মিনিটে গলে গিয়ে জল হয়ে উঠত ফেণায় ফেণা। সেই ফেণা খেয়েছি, আর আপনার এই একটু ফেণা সহ্য করতে পারব না।”

আমি ডায়েরী এনে তারিখটা লিখে রাখলাম। এবার মাছটা কলের ভেতরে লাফিয়ে পড়ে চলে গেল।

শনিবার চারটে বাজবার দু' মিনিট আগে লিকির ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হলাম। দরজায় ঘা দিতেই দরজা খুলে একটি বাচ্চা ছেলে বেরিয়ে এল। ভালো কথা, এবার আর দেয়ালটা ছিল না। লিকি আমাকে নিয়ে গেলেন বসবার ঘরে। আজ

তাঁকে সত্যিকারের যাদুকরের মতই দেখাচ্ছিল। একটা টুপি পরেছেন তার চার কোণে হিজিবিজি লেখা, নানা রকমের পাথরের মালা ঝুলছে টুপি থেকে। পরনে কালো এক আলখাল্লা, অতিথিরা সব এরই মধ্যে এসে পড়েছেন। একজন মোটাসোটা ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে লিকি বললেন, "ইনি মিঃ ওব. একজন পদার্থবিদ। এক সময়ে এক রেলওয়ে থেকেই তাঁর আয় ছিল বছরে তিন হাজার পাউণ্ড। লাগেজ নিয়ে ঘুরে তিনি এই আয় করতেন।"

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। লিকির মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।

"বুঝতে পারছেন না। বেশি লাগেজ নিয়ে ঘুরলেই ত রেল কোম্পানীকে পয়সা দিতে হয়, কিন্তু মিঃ ওবের বেলায় রেলওয়েকেই উলটে পয়সা দিতে হত। কেন না, একখানা টিকিটে যতটুকু ওজনের জিনিস নিয়ে বিনা মাশুলে ট্রেনে চলা যায়, সেটুকু ওজনও মিঃ ওবের জিনিসপত্তরের হত না। এমন কি ওজনের কাঁটায় চড়ালে দেখা যেত, একদম ওজনই নেই। কাঁটা যেমনি ছিল ঠিক তেমনি আছে। এখন আইনের ব্যাপারই হচ্ছে আলাদা। যখন ব্যাগে বেশি ওজন হবে, তখন রেলওয়ে কোম্পানী কড়ায় গণ্ডায় তার মাশুল আদায় করে নেবে। তেমনি একেবারেই যদি ওজন না থাকে, তখন কি হবে? আগে একথা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। কেন না, জিনিসের ওজন কিছু না কিছু থাকবেই। কিন্তু এবার

রেলওয়ে কোম্পানী মুস্কিলে পড়ল। তাঁরা শেষে রফা করে নিল, মিঃ ওব বিনা ভাড়ায় ত যেতেই পারবেন, উপরন্তু প্রতি-ট্রিপে কিছু কিছু পাবেনও। ইংলণ্ডের রেলে ত এই ব্যবস্থা হল, কিন্তু স্কটল্যাণ্ডের রেল বিভাগ ত আর অতশত জানেনা। তারা একবার আবারডিনে মিঃ ওবকে ধরে ফেলল। ওব ও ত ছাড়বার পাত্র নন। তিনিও মোকদ্দমা লড়লেন। রেল কোম্পানীকে মোটা টাকা দিতে হল। কিন্তু বছর দুই হল পার্লামেণ্টে থেকে এক আইন করে এই আয় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এখন উনি বেকার। তবে শীগ্‌গিরই সিনেমা থেকে যাতে পয়সা পান তারই একটা পরিকল্পনা করছেন।” ·

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “কিন্তু ব্যাপারটা কি করে সম্ভব হল ?” “মিঃ ওব একজন মস্তবড় পদার্থবিদ কিনা”, লিকি হেসে বললেন, “উনি কতকগুলো স্পেশাল ব্যাগ তৈরী করলেন। কাঁটায় যখন ব্যাগগুলো চড়ানো হত, তখন ব্যাগটার একটা বোতাম টিপে দিলেই খুলে গিয়ে তার ভেতরে হাইড্রোজেন ঢুকত। ব্যাগ হাইড্রোজেন ভরতি হয়ে বেলুনের মত ফুলে উঠলে কি আর তার ওজন থাকে।”

“কিন্তু বেলুনটা উড়ে যেতে পারত ?”

“হাঁ, সেই খানেই ওব সাহেবের বাহাদুরি। হাইড্রোজেন গ্যাস ঢুকে ব্যাগের মধ্যে একটা ইলেকট্রো-ম্যাগনেট বসানো ছিল সেটাকে চালিয়ে দিত। দেখতে দেখতে কাঁটা শুদ্ধ টেনে উপরে তুলে নিত। তখন রেলের কর্মচারীরা ভারী ভারী

বস্তা এনে চাপালেও, কাঁটায় একটুও ওজন উঠত কিনা সন্দেহ। মিঃ ওব কিন্তু যাদুবিদ্যা শিখলে আরও মজার মজার সব কাজ করতে পারতেন। কতবার বলেছি, কিন্তু ঐ পদার্থ বিদ্যা নিয়েই পড়ে আছেন।

"এবার অন্য অতিথিদের দেখুন। ঐ যে ঐ কোণে যিনি বসে আছেন, উনি হচ্ছেন দেবদূত রাফায়েল। এখানে নানা অদ্ভুত ব্যাপার ঘট্‌বে, অতিথিরা ভয়ও পেতে পারেন, কিন্তু একজন দেবদূত যদি উপস্থিত থাকেন, তাহলে আর কেউ ভয় পাবেন না। সবাই বুঝতে পারবেন, কারো কোনো ক্ষতি হবে না। তবে ওঁর কত কাজ, যদি কাজ ফেলে এখানে ওঁকে আসতে হত, আমি নিমন্ত্রণই করতুম না, কিন্তু একজন দেবদূত একই সময়ে একশ' জায়গায় নানারকম কাজ করতে পারেন। এই ত দেখছেন, উনি এখানে বসে দিব্যি পাইপ টানছেন, অথচ এখন বোগদাদে উনি বিধবা আর অনাথদের সাহায্য করছেন; টোপেকায়, এক বুড়োকে ভিড়ের মধ্যে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন; ব্রেজিলে কুড়োচ্ছেন অর্কিড, আর স্বর্গ আর পাতালের মধ্যে যে বিরাট মাঠ আছে সেখানে সয়তানদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলছেন।"

রাফায়েলকে আমি বললাম, "আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি খুব আনন্দিত হলাম।"

দেবদূত রাফায়েল হেসে বললেন, "আমারও খুব সৌভাগ্য যে আপনার মত লোকের সঙ্গে আলাপ হল। আর মিঃ

লিকির পার্টি আমি খুবই পছন্দ করি। এখানে আসার মস্ত বড় সুবিধে হচ্ছে, লম্বা টেইল কোটের ভেতরে পাখা ঢেকে আসতে হয় না। আমার পাখা আবার চামড়ার নয়, পালকের। লম্বা টেইল কোটে পাখা ঢুকিয়ে রাখলে যা সুড়সুড়ি লাগে।”

এবার ঘরে পাঁচ'ছটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, এসে ঢুকল। তার পরে এলেন একজন চলচ্চিত্র জগতের তারকা, সবে হলিউড থেকে লণ্ডনে ফিরেছেন তিনি। একজন নাবিককে দেখা গেল তাঁর পেছনে। একজন চীনে ছাদ ফুঁড়ে এসে হাজির হল, সয়তান এল মেঝে ফুঁড়ে উঠে। সয়তান বলে তাকে চেনাই যায় না। একেবারে ফুল বাবুটি। গেলাসের মত মস্ত বড় এক টুপি তার মাথায়, পরনে দামী পোষাক। ঘরের ভেতরে এসেই সে টুপি খুলে ফেলল, মাথার মস্ত বড় শিং জোড়া দেখা গেল। ওদিকে পাতলুনের পেছন ফুটো করে লেজটাও যে কখন বেরিয়ে পড়েছে, বেচারা জানতেই পারে নি। সে দেবদূতকে দেখে বেশ বিরক্ত হয়েছে বলেই মনে হল। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে একটা দায়-সারা গোছের নমস্কার সেরে হলের আর এক পাশে চলে গেল। এদিকে লিকির হলটা খুব বড় নয়। ভাবলাম, এত লোক এখানে ধরবে কি করে। তাকিয়ে দেখি, হলের দুপাশের দেয়াল হেলে দুলে সরে যাচ্ছে, আর সেখানে দেখতে দেখতে একটা সোণার টবে গজিয়ে উঠেছে এক একটা অদ্ভুত গাছ।

লিকি বললেন, কে কি হতে চান —পৃঃ ১০৭ (ক)

কেউ হল হাতি কেউ বা প্রজাপতি—পৃঃ ১০৯ (খ)

সে-গাছে ডাল পালা ত আছেই, আরও ধরেছে ফল। সে ফল আবার যে সে ফল নয়, চেয়ার ফল। চেয়ার ফল দেখতে দেখতে পেকে টুপটাপ করে মেঝেয় খসে পড়ল। এই চেয়ার-গাছের পেছনে একটা চকোলেট আর টফিগাছও দাঁড়িয়ে আছে। চেয়ারে যে গিয়ে বসছে, এই গাছ দু'টির ডাল তাদের মুখের কাছে নুয়ে পড়ছে। কত রকমের চকোলেট আর টফি যে সেখানে ফলেছে কি বলব। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভিড় জমে গেছে সেখানে।

এবার লিকি বললেন, "যাঁদের আসবার কথা ছিল, সবাই এসেছেন। এখন এটা হচ্ছে বাহারে পোষাকের পার্টি, আর আপনাদের নিমন্ত্রণ পত্রে আপনারা নিশ্চয়ই পড়েছেন যে, সে বাহারে পোষাক আমিই আপনাদের দেব। এখন বড় বড় লোকের বাড়ীতে এমনি ধরনের যে-সব পার্টি হয়, তাতে কেউ বা সাজে সার্কাসের ক্লাউন, কেউ বা জমিদার, কেউ বা মস্ত রাজা। কিন্তু আমি আপনাদের ইচ্ছে মত রাজা, বা ক্লাউনও করে দিতে পারি, আপনারা ইচ্ছে করলে মৌমাছি হতে পারেন, হতে পারেন মোটর কি ইঞ্জিন, কি আকাশের তারা। বলুন আপনাদের কার কি ইচ্ছে?"

একটি মোটা ছেলে বলল, "আমাকে একটা হাতি করে দিন না।"

লিকি যাদুদণ্ড ছোঁয়াতেই ছেলেটি হাতি হয়ে গেল। কিন্তু খুব বড় হাতি নয়, একটা টাট্টু ঘোড়ার মতই ছোট, কিন্তু

পা-গুলো বেশ থামের মত মোটা। সেও হাতি হয়ে ভারী খুশি, শুঁড় তুলে ছুটল টফি আর চকোলেট খেতে। এবার চলচ্চিত্রের সেই তারকা ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, "আমি হতে চাই এক প্রজাপতি। বেশ মনের আনন্দে ঘুরে ঘুরে বেড়াব।" দেখতে দেখতে একটা মস্তবড় পাঁচফুট লম্বা প্রজাপতি হয়ে তিনি উড়তে শুরু করলো। এখন প্রজাপতি অতবড় হলে কি আর সুন্দর দেখতে হয়! তোমরা একটু চোখ বুঁজে ভেবে দেখ না।

চসমা চোখে একটি ছোট্ট মেয়ে একপাশে চুপ করে বসে ছিল। টফি বা চকোলেট গাছের ডাল কতবার তার মুখের উপর থোলো থোলো টফি আর চকোলেট বুলিয়ে দিয়ে চলে গেল, কিন্তু তার ওসব দিক নজর নেই। একখানা বই-এ মুখ গুঁজে সে পড়ছিল। অত পড়লে আর চোখ খারাপ হবে না। আমি ত ওসব বইয়ের পোকা ছেলেমেয়েদের পছন্দ করিনে, তোমরাও কর না নিশ্চয়ই। লিকি তাকে ডেকে বললেন, "খুকু, তুমি কি হবে বল ত?" সে বই থেকে মুখ তুলে বলল, "আমি শেক্সপিয়ার হতে চাই।" সে সত্যিই শেক্সপিয়ার হয়ে গেল, আর সারা বিকেল ধরে কবিতায় কথা বলল। অত ছোট্ট মেয়ে যখন শেক্সপিয়ারের মত লম্বা দাড়ি নেড়ে চোখ বড় বড় করে কথা বলছিল, তখন ত সবাই হেসেই অস্থির। একটা মোটা সোটা মেয়ে হল এক প্রকাণ্ড কচ্ছপ। মিঃ ডবস্ হলেন একখণ্ড স্ফটিক, তিনি মেঝেয় গড়াতে গড়াতে

চললেন। আর একটি মহিলা একজন জার্মান রাজকুমারী হয়ে জার্মান ভাষায় বড় বড় কথা বলতে লাগলেন। ছেলেদের মধ্যে একজনের সখ হল, সে রোলস রয়েস গাড়ী হবে। দেখতে দেখতে ঘরের মেঝেয় একটা ক্ষুদে রোলস রয়েস দেখা দিল। চকোলেট গাছটার একটা ডালে একটা পেট্রল পাম্প তৈরী হল, সেই পাম্প থেকে তেল ভরতি করে দেয়া হল মোটরে। এবার গাড়ী ছুটতে লাগল এদিক ওদিকে। কারো গায়ে ধাক্কা লেগে এ দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্যে লিকি আগেই সমস্ত গাড়ীটাকে রবারের মত তুলতুলে নরম করে দিয়েছিলেন। এই ত আমার সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল একবার, কিন্তু কিছুই হল না। মনে হল, একটা তুলতুলে রবারের বল এসে ধাক্কা মারছে। একটি মেয়ে পরী হয়ে উড়তে শুরু করল ডানা নেড়ে। একটি ছেলে মেজর জেনারেল হয়ে গলায় সারি সারি মেডেল ঝুলিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সেই যে চীনেটি যিনি ছাদ ফুঁড়ে এসেছিলেন তিনি হচ্ছেন একজন তিব্বতের লামা। তাঁকে যখন বলা হল, "আপনি কি হতে চান।" তিনি বললেন, "যেমন আছি, তেমনিই থাকব।" লিকি বললেন, "তাকি আর হয়? সবাই বাহারে পোষাক পরবে আর আপনি সাদা সিধে পোষাকে থাকবেন!" তাকে লিকি তিব্বতের এক অদ্ভুত জানোয়ার তৈরী করে দিলেন। নাবিকটি হল এক মস্ত কুকুর। এবার আমার পালা। আমি

ভেবেই পাচ্ছিলাম না, কি হব। জানোয়ার হতে আমার বিশ্রী লাগে ; মানুষ ত আছিই, বড় জোর বদলে গিয়ে চার্লি-চ্যাপলিন কি অন্য কেউ হব, তাতেই বা আনন্দ কি। যন্ত্রপাতি আমার দু'চোখের বিষ, এখন কি হব ? শেষে অনেক ভেবে ঠিক করে ফেললাম, আমি হব আকাশের ধূমকেতু। যে কথা সেই কাজ।

ধূমকেতু হলাম। ছোট, বোধ হয় সবচেয়ে ছোট ধূমকেতু হলাম আমি। আমি লম্বায় ছ'ফুট, ধূমকেতুর শরীরও ওর এক চুলও বেশি হলনা লম্বায়। অথচ কত বড় বড় একটা ধূমকেতু ওঠে জানো ? এই যে ধূমকেতু আকাশে উঠেছিল বহুদিন আগে, তোমাদের বাবা-মারাই তখন তোমাদের মত ছোট— সেটা নাকি কোটি কোটি মাইল লম্বা ছিল।

ধূমকেতু হয়ে শূন্যে উঠে আলোর চারপাশে উড়তে লাগলাম। ঘড়ির পেটের ভেতরে যেমন কলকব্জাগুলো চলতে থাকে, মনে হল আমার পেটের ভেতরেও তেমনি কি যেন চলছে।

আরো দু'টি ছেলে তখনও বাকি ছিল। একজন হল খুব বড় এক গলদা চিংড়ি, তার সাঁড়াশির মত ঠ্যাং দেখে তোমরাও ভয় পেতে। ওই ঠ্যাং দিয়ে কাউকে যদি চেপে ধরে তার দফা তখনই শেষ। ভাবলাম আমি ত শূন্যে আছি, আমার আর ভয় কি। কিন্তু অত গোদা গোদা ঠ্যাং থাকলে কি, বেচারা একেবারে নিরীহ। শেক্সপিয়ার এসে ওর পিঠে

চেপে বসল, তবু ও কিছু বলল না। এদিকে সেই জার্মান রাজকুমারীকেও দেখা গেল কচ্ছপের পিঠে। যে ছেলেটি বাকি ছিল, সে বায়না ধরল ভূত হবে। লিকি বললেন, "ভূত একদিন তুমি হবেই, কিন্তু জীবনে যে সব জিনিস হতে পারবে না কখনও, তারই একটা কিছু পছন্দ কর। যেমন ধর, একটা হাঁড়ি, ডাইনোসেরাস, কি প্রকাণ্ড একটা দৈত্য।" ছেলেটা নাছোড়বান্দা। লিকি আর কি করেন, তাকে ভূত করে দিলেন।

ছেলেটি যখন ভূত হয় আমি দেখতে পাই নি। তখন টফি গাছের ডালে আমার ঝাঁটার মত লেজটা আটকে গিয়েছিল। কোনো রকমে লেজ ছাড়িয়ে নিয়ে নীচে তাকিয়ে দেখলাম, সয়তান আর দেবদূতে তুমুল ঝগড়া বেঁধে গেছে। ভূত হতে দেখেই সয়তান তাকে তাড়া করল। ছেলেটা নাকি রোজ ক্লাস পালায়। রাফায়েল তাকে ধমকে বললেন, "ক্লাস পালালে কি হবে, ছেলেটি মাকে খুব ভালোবাসে। সেদিন একটা কুকুরকে সে একটা গর্ত থেকে বাঁচিয়েছিল। আর ক্লাস পালানো তেমন দোষেরও নয়।" লিকি ঝগড়া থামিয়ে দিয়ে বললেন, "পার্টিতে এসে আপনাদের কাজের কথা ভুলে যাওয়াই উচিত। আপনাদের কাছে এইটুকু আমি আশা করতে পারি কি?" সয়তান আর দেবদূত মাথা নীচু করে যে যাঁর যায়গায় ফিরে গেলেন।

ভূত হয়ে ছেলেটা কিন্তু দুষ্টুমী শুরু করল। সেই যে

নাবিকটি একটা প্রকাণ্ড বুল-টেরিয়ার হয়েছিল, তার কাছে গিয়ে তার লেজ ধরে টানল। এখন বুল-টেরিয়ার ওর মত একটা খোকা ভূতকে ভয় পাবে কেন? সে প্রথমে কিছু বলল না, তারপর বারবার টানাটানি করায় সে রেগেমেগে তেড়ে এল। খোকা ভূত সুড় সুড় করে ওর প্রকাণ্ড হা-র মধ্যে ঢুকে গেল, কুকুর মুখ বুঁজল, কিন্তু একটা ভূত আস্ত হজম করা ত আর চাট্টিখানি কথা নয়! পেটের ভেতরে শুরু হল তোলপাড়। দেখলাম, কুকুরটা গড়াগড়ি যাচ্ছে, খানিকক্ষণ পরে মুখ তাকে খুলতেই হল। সঙ্গে সঙ্গে ভূতও বেরিয়ে এল। এবার ভূত গেল শেক্সপিয়ারের কাছে। শেক্সপিয়ার কিন্তু ঘাবড়ালেন না। তাঁর হামলেট নাটকটায় তিনি অমনি একটা ভূতের কথা লিখেছিলেন; আবার থিয়েটারে সেই পার্টও তিনি অমন পাঁচশ' রাত্তির করেছেন—তাঁকে ভয় দেখাতে গেছে একটা বাচ্চা ভূত! তিনি হাত নেড়ে গম্ভীর স্বরে বললেন :

রে ভূত,
আমারে দেখাতে ভয়
এসেছিস ?
জানিস কি, কতবর্ষ ধরি
করিয়াছি
ভূতের ভূমিকা।

ভূত তাঁর কথা শুনেই সেখান থেকে দে ছুট। শুনেছি,

ভূতদের নাকি আবার অমিত্রাক্ষর ছন্দের বড় ভয়। ওরা ছড়া কাটতে পারে, কিন্তু অমন না-গন্থ, না-পন্থ ছড়া শুনলে ভয়ে পালিয়ে যায়। তোমরা একটা হানা বাড়ীতে ঢুকে একবার মাইকেলের মেঘনাদ-বধের প্রথম কটা লাইন আউড়ে দেখো ত কি হয়!

ভূত এবার গেল রোলস রয়েস চালাতে, রোলস রয়েসের ভেতরে তার মাথা আর শরীরের অর্দ্ধেকটা স্বচ্ছন্দে ঢুকে গেল, কিন্তু বাকি অর্দ্ধেক আর ঢোকে না। এক ফোঁটা একটা মোটরে ঢুকবেই বা কেন? ততক্ষণে রোলস রয়েস ছুটতে শুরু করেছে। আমরা ওর মাথা আর শরীরের অর্দ্ধেকটা দেখতে পাচ্ছিলাম না, শুধু দেখছিলাম, দু'খানা সরু সরু পা গাড়ীর বাইরে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে। কন্ধকাটা ভূতের নাম তোমরা শুনেছ নিশ্চয়ই। তাদের মাথা থাকে না, ওকে দেখে আমাদের তাই মনে হচ্ছিল।

আমি যখন অক্সফোর্ডে পড়তাম, তখন আমরা যে বোর্ডিংটায় থাকতাম, তার ছাদে একটা ভূত থাকত। সে সাবেকী আমলের বনেদী ভূত। প্রথম চার্লসের সময় থেকে সে নাকি ওখানে আছে। পঞ্চাশ বছর আগে পুরনো কলেজ বাড়ীটা ভেঙেচুরে আবার নতুন করে তৈরী করা হল, কিন্তু ভূতকে তাড়ানো গেল না। দুপুর রাত্তিরে ভূত তখনো দিব্যি ছাদে ঘুরে ঘুরে হাওয়া খায়। আমার একজন বন্ধু তাকে একদিন দেখেছিল। সে আমাদের বলল, "ভাই, ভূতের জুতো

জোড়ার তলাটা একেবারে ক্ষয়ে গেছে। সে আজকাল তাই কোনো রকমে ঘসড়ে ঘসড়ে চলে। ভূতের জুতো বলেই এখনও চলতে পারছে। নইলে তিনশ' বছরের পুরনো জুতোর এক টুকরো চামড়াও কি আস্ত থাকত? এস আমরা চাঁদা করে ওকে এক জোড়া নতুন জুতো কিনে দি।" আমরা সবাই রাজি হলাম। কিন্তু মাপ পাওয়া গেল না বলে আর নতুন জুতো কিনে দেয়া হয় নি। এখনও সে নাকি ঘসড়ে ঘসড়ে ছাদে বেড়ায়।

এবার লিকি আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "চা খাওয়ার সময় হয়েছে। আপনাদের যার যার চা খেতে অসুবিধা হবে, আমাকে বলুন, আমি তাদের চেহারা বদলে দিচ্ছি।"

আমি আর মিঃ ওব আমাদের চেহারা বদলে দিতে বললাম। কেন না, স্ফটিকের বল আর ধূমকেতুর মুখই নেই, চা খাবে কি করে? ভূতকে জিজ্ঞেস করা হল, সে তার চেহারা বদলাবে কি না। ভূত রাজি হল না। কিন্তু লিকি বললেন, "তোমার শরীরের ভেতরে সব কিছু দেখা যায়। তুমি না চাইলেও তোমার ভোল আমি বদলে দেবই। তোমার পেটের ভেতরে চা বা চিবনো কেক ধীরে ধীরে নামছে, এ আমরা কেউ দেখতে চাই না।"

মিঃ ওব মানুষ হলেন। ভূত হল একটা ইঞ্জিন। সে ভেবেছিল, ইঞ্জিন হলে বুঝি খুব খেতে পারবে। কিন্তু লিকি তাকে এমন একটা ইঞ্জিন করে দিলেন, যার কাজ হচ্ছে

তেলে আগুন ধরলে জল ঢেলে সেই আগুন নেবানো। বেচারার পেটভরে চা খাওয়া হল না। আমি হলাম একটা নাম-না-জানা পাখী। উড়ে গিয়ে টফিগাছের ডালে বসলাম।

লিকি বললেন, "মানুষকে জন্তু করে দেয়া খুবই সহজ কাজ। কয়েক লাখ বছর আগে আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা ছিল জন্তু, আর আমার মনে হয় কয়েক হাজার বছর পরে মানুষরা আবার জন্তু হয়ে যাবে, এবার তার লক্ষণ ত মানুষের এই সমাজের চারদিকে দেখতে পাচ্ছি। ওসব কথা যাক্, মানুষকে জন্তু করার গল্প আপনারা নিশ্চয়ই আরও অনেক জানেন। সেই যে মায়াবিনী সার্সী ইউলিসিসের সঙ্গীদের সব শুয়োর করে দিয়েছিল। বছর বছর কতলোককে যে যাত্নকরেরা আজ-কাল শুয়োর করে দিচ্ছে, তার কি ঠিক আছে! চীনে-হোটেলে শুয়োরের মাংসের রকমারি কাবাব আপনারা খেয়ে তারিফ করেন, কিন্তু জানেন কি ও-গুলো সবই শুয়োরের নয়, হু'একটা যাত্ন-করা মানুষের মাংসও ওর ভেতরে আছে। উইল্‌টশায়ার ভাল শুয়োরের মাংসের জন্য বিখ্যাত, ওখানকার একটা ঘটনা বললেই আপনারা বুঝতে পারবেন আমার কথা সত্যি কিনা।

"আমি একটি ছেলেকে চিনতুম তার নাম হিগিনবোথাম। খুব পেটুক ছেলেটি। একদিন সে গেল চিলমার্ক-এর একটা বনে চড়ুই ভাতি করতে দলবল নিয়ে। এখন চিলমার্ক আবার উইল্‌টশায়ারের মধ্যে, ওখান থেকে আমাদের পার্লামেন্টের

বাড়ী তৈরী করবার জন্য পাথর আনা হয়েছিল। তখন মোটর গাড়ীর চলন হয়নি। একটা গাড়ীতে করে খাবার আসছিল, কিন্তু পথে গাড়ীর চাকা খুলে গাড়ীখানা অচল হয়ে গেল। খাবার-টাবার যা ছিল সব পথে ছড়িয়ে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল। এদিকে হিগিনবোথাম আর তার দলবলের পেট তখন ক্ষিধেয় চোঁ চোঁ করছে। কিন্তু সবাই ত আর তার মত পেটুক নয়, কোমরে বেল্ট কষে বেঁধে তারা কোনো রকমে ক্ষিধের জ্বালা থামাল। এদিকে পাশেই ছোট ছোট চারা গাছে ভর্ত্তি একটা ঘন জঙ্গল; সেখানে ছিল নানা অদ্ভুত ধরনের ফল। হিগিন-বোথাম সেখানে গিয়ে ফলগুলো গোগ্রাসে গিলল। এখন সেগুলোব নাম হচ্ছে সিরসায়া লিউডোডিয়ানা-সার্মার ফল। খেলেই শুয়োর বনে যেতে হবে। আর হিগিনবোথাম হলও তাই। ওর বাবা ভাবলেন,শুয়োরই যখন হয়েছে ছেলেটা, দু'বেলা বসে বাপের অন্ন ধ্বংস করে কেন? সার্কাসে ওকে ভর্ত্তি করে দেয়া যাক! বিদ্বান শুয়োর এই বলে বিজ্ঞাপন দিলে হাজার হাজার লোক ছুটে আসবে দেখতে; চাই কি তিনি খেলা দেখিয়ে মস্ত বড় লোকও হয়ে যেতে পারেন। তিনি সেই মার্কিন সার্কাসওলা ফিসকে চিঠি লিখলেন, সে ত তখ্খুনি রাজি। কথা হল, শুয়োরের খেলা দেখিয়ে যা লাভ হবে, তার অর্দ্ধেক বখরা পাবেন ফিস, আর অর্দ্ধেক হিগিনবোথামের বাবা। এদিকে ওর এক কাকা এসে বাগড়া দিয়ে বললেন, "না সার্কাসে ঢোকা হবে না। আমি ওকে মানুষ করে দেব।" তিনি ওকে

মলি ফুল শুঁকে আবার মানুষ হল—পৃঃ ১১৯
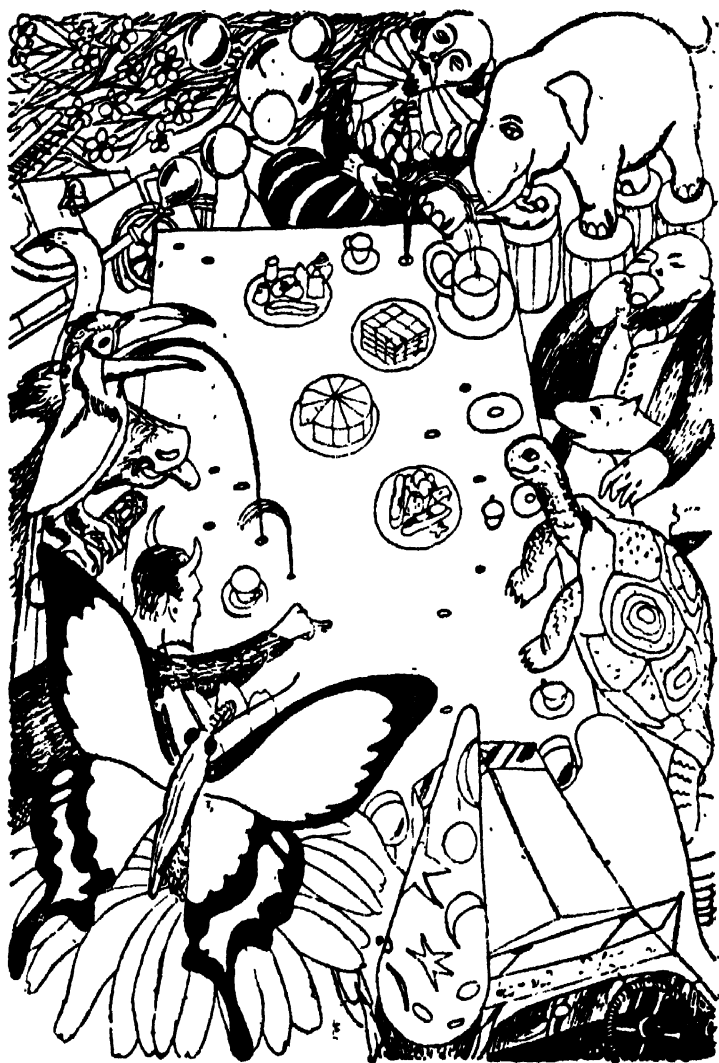
এবার শুরু হল ভোজ—পৃঃ ১২০

নিয়ে রওনা হলেন গ্রীসদেশে। তিনি এক কলেজে গ্রীক ভাষা পড়াতেন বলেই ইউলিসিসের গল্পের সবটা তাঁর পড়া ছিল। মায়াবিনী, সার্সী সবাইকে শুয়োর করে দিলেও ইউলিসিসকে পারে নি। সেই স্যাণ্ডালে পাখা-লাগানো দেবতা মার্কারী তাকে আগেই একটা ফুল দিয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন। ইউলিসিস সেই ফুলের গন্ধ শুঁকেই সে যাত্রা রক্ষা পেলেন। নইলে তাকেও ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে শুয়োরের খোঁয়াড়ে গিয়ে সেঁধোতে হত। কাকা একজন উদ্ভিদবিদ্যার দিগ্‌গজ পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন; তিনি শুধু ফুলটার নামই জানেন, ফুলটা ত আর চেনেন না! ওরা গ্রীসে গিয়ে সব রকম ফুল শুঁকিয়ে যখন হাল ছেড়ে দিয়েছেন, তখন সেই ফুল পাওয়া গেল। ফুলটির নাম হচ্ছে মলি, ছোট ছোট চারা গাছে হয়। হিগিনবোথাম আবার মানুষ হল, কিন্তু গায়ের দাগ আর মেলায় নি। অত পেটুক হলে কি হবে, শাকসব্‌জী কোনো দিন সে আর ছোঁয় নি। আমি একবার তাকে নেমন্তন্ন করেছিলাম, প্লেটে সসেজ দেখে সে এত ভয় পেয়েছিল যে কি বলব? আরে, গল্পে গল্পে যে অনেক সময় কেটে গেছে! আসুন, এবার চা খাওয়া যাক।"

হলের কোণের দেয়ালটা এবার সরে গেল। সেখানে দেখা গেল মস্ত এক টেবিল। কয়েকখানা চেয়ারও আছে, একপাশে একটা পিপে, আর একধারে একরাশ ফুল টেবিল সমান উচু করে রাখা হয়েছে। আমি, পরী, প্রজাপতি তার

উপর বসে পড়লাম। চেয়ার টেনে বসলেন লিকি, রাজকুমারী আর মিঃ ওব। পিপের উপরে হাতি গিয়ে দাঁড়াল। চিংড়ি আর কচ্ছপের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করে দেয়া হল। তিব্বতী লামা তাঁর অদ্ভুত জিরাফের মত গলাটা বাড়িয়ে দিলেন।

প্রত্যেকে টেবিল থেকে একটা করে পেয়ালা তুলে নিলাম। সারি সারি স্বুইচ আমাদের সম্মুখে রয়েছে, কোনোটায় লেখা চা, কোনোটায় দুধ, কোনোটায় বা আইসক্রিম। যার যা খেতে ইচ্ছে, সে সেই স্বুইচ টিপল। দেখতে দেখতে টেবিলের উপর সৃষ্টি হল দুধ, চা, আর আইস-ক্রিমের ঝরণা। সেই ঝরণা থেকে সবাই পেয়ালা ভরে নিল। আমি কিন্তু পেয়ালায় করে খেতে পারলুম না, আমার ঠোঁট এত ছোট যে মুখ না ডুবিয়ে খাওয়া যায়না। তাই একটা বুদ্ধি করে স্বুইচ টিপে দিয়ে তার নীচে মুখ পেতে দিলাম। আশ্চর্য্য, একটু চাও গড়িয়ে পড়ল না!

ইঞ্জিন চা খেল পেট ভরে। কিন্তু ওর মুখ দিয়ে বুদ্বুদ হয়ে তার বেশির ভাগই বেরিয়ে এল। রোলস কি করে চা খাবে ভেবে পাচ্ছিল না। শেক্সপিয়ার তাকে বললেন ঃ

শূন্যে উড্ডীন পক্ষীরা
আর কীট ভূমিতলে
আনন্দে আহার করে।
হে যাদু-রথ, উপবাসী নাহি রবে তুমি!

ভারতের পত্রের নির্যাস,
অবশ্যই পাইবে।

এই বলে শেক্সপিয়ার তার পেট্রল ট্যাঙ্কটা দেখিয়ে দিলেন। মিঃ ওব বললেন, "এই চা সিংহল থেকে এসেছে স্নুতরাং পেট্রল ট্যাঙ্কে ঢেলে দিলে কারবুরেটর বন্ধ হয়ে যাবে।" লিকি রেডিয়েটরের ঢাকনি খুলে তার মধ্যে চা ঢেলে দিলেন। রোলস বলল, এত চমৎকার চা সে জীবনে খায় নি। চা ছাড়াও আমরা কেক আর স্যাণ্ডউইচ খেলাম। তোমাদের আমি বেশি বলতে চাইনে, কারণ তোমরা হয়ত আমাকে পেটুকই ঠাওরাবে। আর অত খাবারের নাম বলে তোমাদের উপরও অবিচার করতে চাই নে। জিভে একটু আধটু জল আসতে ত পারে। কিন্তু কি ফল? তবে এইটুকু শুনে রাখ, যার যা খাদ্য সে তাই খেতে পেল। আমি পাখী, আমার স্নুবিধে ছিল বেশি, আমি ফল, চকোলেট, টফি, দুধ, চা, মধু সবই খেলাম। বুল-টেরিয়ার মাংস আর হাড় পেল। রোলসগাড়ী চা ছাড়া পেল খুব দামী পেট্রল। হাতি ত সব কিছুই খেল! কচ্ছপের জন্য গ্যালাপাগস দ্বীপ থেকে এল বাঁধাকপির পাতা, প্রজাপতি খেলেন সোনালী রঙের মধু, আর আমাদের সয়তান ছ' বাক্স দেশলাই আর সের পাঁচেক সালফিউরিক এসিড খেয়ে চা পর্ব শেষ করল।

চা খাওয়া হয়ে গেলে মিঃ ওব এবার এক প্রকাণ্ড পরমাণু হলেন। তোমরা নিশ্চয়ই বিজ্ঞানে পরমাণু সম্বন্ধে পড়েছ।

পরমাণুকে চোখে দেখা যায় না। কিন্তু মিঃ ওবকে আমরা সবাই দেখতে পেলাম। চারফুট লম্বা বেশ গোলগাল এক পরমাণু, তার ভেতরে ক্ষুদে ক্ষুদে টুকরোগুলো কিলবিল করছে। এতই ক্ষুদে, আর এত জোরে ঘুরছে যে ওই টুকরো-গুলোকে দেখাই যাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে দু-একটা টুকরো ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল। মিঃ ওব আবার একজন বড় বৈজ্ঞানিক, তিনি আমাদের বুঝিয়ে বললেন যে, পরমাণুরা যখন উত্তেজিত হয় তখনই এমনি হয়। তিনি কিন্তু টুকরো-গুলোকে আবার নিজের গোল পেটের ভেতরে পুরে নিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে এমন চমৎকার আলো হল যে কি বলবো!

লিকি এবার শূন্যে আঙুল বুলিয়ে পিয়ানো বাজালেন। সুরের ঢেউয়ে সারা ঘর ছেয়ে গেল। এ হচ্ছে বেটোফেনের জ্যোৎস্নার সুর। বাজনা শুনতে শুনতে আমরা এত বিভোর হয়ে গেছি যে, আমাদের কিছু মনে নেই। এমন সময় একটা ঝগড়া শুনে তাকিয়ে দেখি, হাতি শুঁড় দোলাতে দোলাতে চিৎকার করে বলছে, "সবাইকে নামতে বলুন মিঃ লিকি। ওরা উড়ে উড়ে মজা করে টফি খাবে আর বাজনা শুনবে, এ হতেই পারে না!"

কি আর করি। আমরা পাখাওলার দল নীচে নেমে এলাম। আবার বাজনা চলল।

এমন সময় দড়াম করে খুলে গেল দরজা। দেখলাম, পম্পি ছুটে আসছে, তার নাক মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে আগুনের
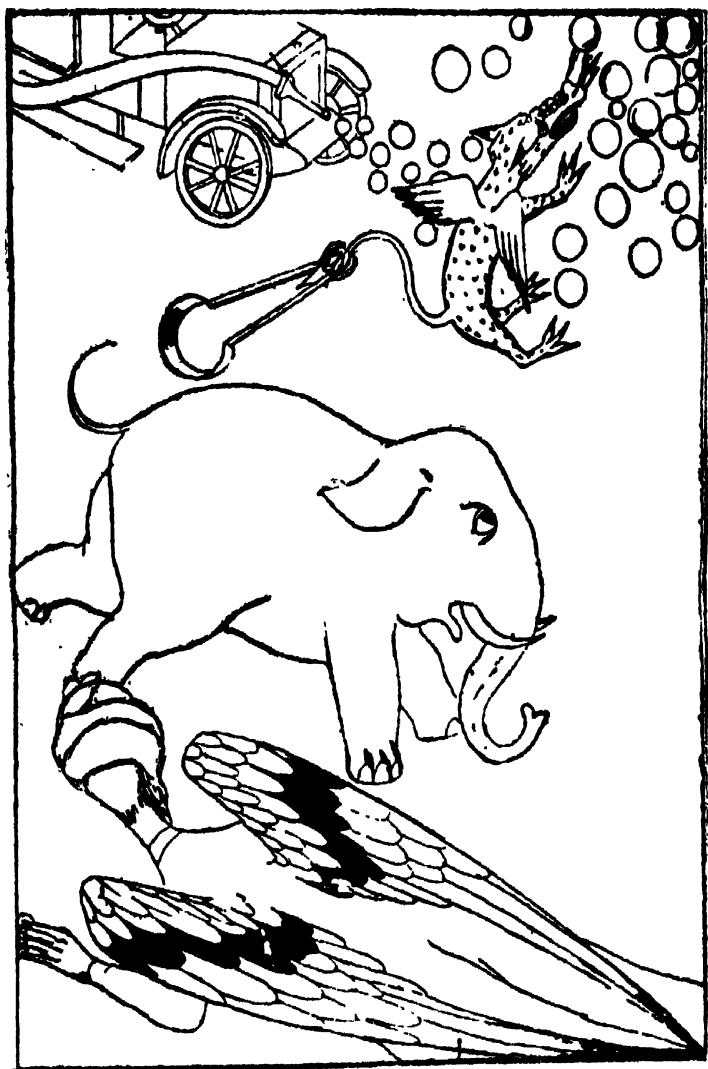
লিকি মস্তবড় চিমটে হয়ে পম্পির লেজটা জাপটে ধরলেন—পৃঃ ১২৩

আব্দুল মক্কার ফোটো তুলছে—পৃঃ ১২৬

ফুলকি। ওকে দেখেই ফুরুৎ করে উড়ে গিয়ে টফি গাছের ডালে বসলাম। বাচ্চা ড্রাগন হলে কি হবে, যদি আমার অমন সুন্দর পাখা পুড়িয়ে দেয়! আর সবাইও কিন্তু ভয় পেয়ে সরে গেল। এক সয়তান বসে রইল, সে এমন কত ড্রাগন দেখেছে, তার আর ভয় কি! ইঞ্জিন এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল, এবার সে পম্পির গায়ে জল ছিটিয়ে দিল। তাতে আগুন ত নিবলই না, বরং পম্পি এত হাঁচতে লাগল যে, সারা ঘরময় আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে পড়ল। একটা ফুলকি গিয়ে পড়ল পরীর পোষাকে। আবদুল মক্কার ঝাঁপিয়ে পড়ল পম্পির উপর। কিন্তু পম্পি ততক্ষণে হাতির দু'পায়ের ফাঁকে সেঁধিয়ে গেছে। আবদুল মক্কার বোকা বনে গেল, এদিকে ভয়ে সবাই চিৎকার করতে শুরু করেছে! লিকি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, একটা মস্ত বড় চিমটে হয়ে তিনি চেয়ার থেকে লাফিয়ে পড়ে পম্পির লেজটা জাপটে ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে এলেন। এবার আবদুল মক্কার তাকে শক্ত করে বেঁধে ফেলল। লিকি খুব রেগে গিয়ে বললেন,

"রে ইফ্রিত কুলের কুলাঙ্গার, আমি কি আদেশ দিই নি যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার অতিথিরা বিদায় না হন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তুই আমার বিরাট স্নানের টবের তলায় এই অগ্নি-খাদককে বন্দী করে রাখবি?"

"এ দাস আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। জানি না, কোন অধম যাদুকর তার সে বন্ধন মোচন করেছে।"

এমন সময় যে লোকটা ঘরে ঢুকল, তাকে দেখেই চিনলাম লোকটা প্লাম্বার। তার হাতে একটা স্ক্রু খোলবার মস্ত বড় যন্ত্র। এখন প্লাম্বার কাকে বলে জানো? মাঝে মাঝে দেখবে, বাড়ীর কলে জল পড়ছেই না, পড়লেও ফোঁটা ফোঁটা। তখন বুঝতে হবে যে নলটা দিয়ে বাড়ীতে জল আসে, সেটার কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। তখনি তোমাদের বাবা বা দাদারা এমন একজন লোক খুঁজে নিয়ে আসেন, যে নাকি নানা রকম যন্ত্রপাতি নিয়ে পাইপের মুখ খুলে ঠিক করে দিয়ে যায়। জল তখন আবার কলের মুখ দিয়ে জোরে পড়তে থাকে। এই লোকটিকে বলা হয় প্লাম্বার। এখন প্লাম্বার এসেই লিকিকে বলল, "দেখুন কর্তা, আমাকে আপনি কি ভেবেছেন বলুন ত? আমি ত আর সেণ্ট জর্জ নই যে, ড্রাগন মারতে এসেছি। আমি এসেছি জলের পাইপ সারাতে—"। এই বলেই লোকটা থেমে গেল। আমাদের সবাইকে দেখে ত সে অবাক!

লিকি বললেন, "বোস হে, আমাদের সঙ্গে একটু চা খেয়ে যাও। ড্রাগন মারবার জন্য তোমাকে আনা হয় নি।" এই বলে লিকি তার যাদুদণ্ডটা আলগোছে তার গায়ে ছুঁইয়ে দিলেন। এবার তার চমকানো ভাব কেটে গেল।

"না, না, আমি চা খেয়ে এসেছি কর্তা।"

"আচ্ছা চা না খাও, তোমার জন্যে সরবৎ আনতে বলছি।" লিকি আবদুল মক্কারের দিকে ফিরে বললেন, "হে আবদুল

মক্কার, এই নল-রক্ষকের নিমিত্ত তুমি আরবের বিখ্যাত সরবৎ আনয়ন কর!"

আবদুল মক্কার একবার হাত শূন্যে তুলে নামাল, দেখলাম একটি সুন্দর কাচের জাগ তার হাতে। গেলাস ভর্তি করে সেই কাচের জাগ থেকে ঢেলে তাকে সরবৎ খেতে দেয়া হল। সে সরবৎ খেয়ে খুশি হয়ে চলে গেল। এবার সয়তান বলল যে, তার বিদায়ের সময় হয়ে এসেছে। স্কটল্যাণ্ডের একজন পাদ্রিকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে হবে এক হোটেলে। সেখানে আজ বিরাট নাচের আসর বসবে। এখন পাদ্রি ত আর নাচ পছন্দ করেন না, তাঁকে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়া আর সোজা কথা নয়! কিন্তু কি করবে, সয়তান হুকুমের চাকর। নরক থেকে হুকুম হয়েছে, না মেনে উপায় নেই।

"এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে তুমি, এ বড়ই দুঃখের কথা", লিকি বললেন, "যাক তোমরা সকলেই এই ক'ঘণ্টা বেশ আনন্দে কাটিয়েছ নিশ্চয়ই। এখন সবাইকে আবার মানুষ করে দেব। কিন্তু তোমরা যদি ইচ্ছে কর, তোমাদের নাম আমি বদলে দিতে পারি।"

শেক্সপিয়ার বললেন:

নাম! নামে কিবা যায় আসে বল?
যে নামে গোলাপে ডাক সে নামে সে
তেমনি সুন্দর।

লিকি উত্তর দিলেন, "তা আসে যায় বই কি! কারো যদি

নাম হয় মিঃ চিজ, মিঃ ফিস অ্যাণ্ড চিপস ফ্লাওয়ার, তা হলে তার তুঃখ হবে না নাকি! নামেই ত সব। বিদঘুটে নামের জন্য কত লোক জীবনে কিছু করতে পারল না। বল, কে কে নাম বদলাবে?

ভিক্টোরিয়া বলে একটি মেয়ে বলল, তার নামটা বড্ডো সেকেলে, একালে চলে না। তার নাম বদলে দিয়ে নাম রাখা হল আইরিন। অগাস্টাস নামে একটি ছেলে ছিল, সে হল টম।

এবার সবাই আমরা হলের মাঝখানে এসে জড়ো হলাম। আবতুল মক্কার একটা ক্যামেরা নিয়ে এসে হাজির হল, আমাদের গ্রুপ ফোটো তুলবে। ফোটো তোলা হল। প্রজাপতি এত নড়ছিল! নড়লে কি আর ফোটো ভাল ওঠে। এবার লিকি সবাইকে চোখ বুজতে বললেন। আমরা যখন চোখ বুঁজে ছিলাম, তখন তিনি কি করলেন জানি না, তাকিয়ে দেখি সবাই মানুষ হয়ে গেছি!

এবার বিদায়ের পালা। কেউ যাতু-গাল্‌চেয় চড়ে বাড়ী ফিরলো, কেউ ফিরলো বাসে। আমি হেঁটেই বাড়ী এলাম। এসে দেখি আমার টেবিলের উপর তু'খানা মস্ত বই কে রেখে গেছে। তার একখানায় আছে ধূমকেতুর ছবি, আর একখানা ভর্তি পাখীর ছবিতে। আমি যে পাখীটা সেজেছিলাম, তার ছবিও বইয়ে আছে বই কি।

তারপরে কিন্তু আর লিকির দেখা পাই নি, দেখা পেলেই

তোমাদের জানাব। রাফায়েলের সঙ্গে সেদিন পথে দেখা হয়েছিল। তিনি তখন মজুরের পোষাক পরে একটি বুড়ীকে রাস্তা পার করে দিচ্ছিলেন। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হাসলেন। লিকির দেখাও একদিন এমনি হঠাৎ পেয়ে যাব। সেই আশায় বসে আছি। তোমরাও থেকো কিন্তু!

আমার কলারের যাদু-বোতাম

তোমরা ভাবছ, লোকটা কি এক আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে বসেছিল! যাদুকর, জিন, ডাইনী বুড়ী—ওসব আজকাল আর আছে নাকি?

হাঁ আছে বই কি!

তবে রূপকথার বইয়ের যে সব ছবি দেখ, তেমনি পোষাক পরে তারা আর বাইরে বেরোয় না। রাতদিন খুঁজে মরলেও প্রজাপতির মত পাখাওলা একটি পরী তোমরা দেখতে পাবে না। অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটে ভিড়ের মধ্যে কোনো ডাইনীবুড়ী ঝাঁটায় চড়ে চলেছে, একথা বললে লোকে তোমাদের পাগলই বলবে। তোমরা হয়ত জিজ্ঞেস করবে, কোথায় গেল তারা? কোথায় তাদের দেখা পাওয়া যাবে? কেন তোমাদের ঘরে ঘরেই ত তাদের নানা কীর্তি রয়েছে। কি, অবাক হয়ে গেলে না ত? রেডিও, গ্রামোফোন, ফিল্ম যাঁরা তৈরী করেছেন, তাঁরা কি সামান্য যাদুকর নাকি! আজকালকার যাদুকর ত তাঁরা-ই। তুমি খুব অসুখে পড়েছ, ডাক্তার নোট-বইয়ের একটা পাতা ছিঁড়ে কি খানিকটা লিখে দিলেন! লোক ছুটলো ডাক্তারখানায়, ওষুধ এল। ওষুধ খেয়ে যদি সেরে ওঠ, তাহলে ডাক্তারকে কি বলবে বল ত? আমি ত বলব

ডাক্তারই হচ্ছেন যাদুকর। ঐ ছোট্ট পাতায় এমন একটা মন্ত্র তিনি লিখে দিয়েছিলেন, ডাক্তারখানা থেকে ঐ মন্ত্র বলে এমন ওষুধ উড়ে এল যার ফলে তোমার অসুখ গেল সেরে। পরীদের কথা বলছ? হ্যাঁ পরী ত আছেন, কিন্তু তাঁরা তোমার আমার মতই দেখতে।

নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে, কি করে আমি চিনলুম তাঁরা পরী। বাঃ রে, আমি চিনব না ত কে চিনবে! আমরা যে পরীর বংশ! আটশ' বছর আগে পরী মেলুসাইন এক মস্ত জমিদারকে বিয়ে করেন, তাদেরই নাতি নাতনী আমরা। আমাদের এই বংশ আজও ইংলণ্ডে রাজত্ব করছে। দ্বিতীয় হেনরী থেকে যত রাজা হয়েছেন, সবাই আমার আত্মীয়। জনের নাম নিশ্চয়ই তোমরা শুনেছ, যাকে প্রজারা চেপে ধরে ম্যাগনাকার্টায় সই করিয়ে নিয়েছিল—সে অত বদ-মেজাজী ছিল কেন জানো? তখনকার দিনের লোকেরা বলত, পরীর বংশ বদমেজাজী ত হবেই। দ্বিতীয় হেনরীর ত ছিল বেজায় রাগ! রেগে গেলে তিনি বিছানার চাদর দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলতেন। রাজা পঞ্চম জর্জ আর আমি দু-জনেই এই বংশের লোক। পঞ্চম জর্জ পেয়েছেন রাজ-মুকুট, আর আমি পরীর মেজাজ পেয়েছি ষোলো আনা। অবিশ্যি, হেনরীর মত অত রাগ আমার নেই। সাতশ' বছর পরে মেজাজ খানিকটা না ক্ষয়ে কি আর পারে!

এখন মেলুসাইন—আমাদের সেই পরী ঠাকুমার নাম,

প্রতি সপ্তাহে শনিবার দিন সাপ হয়ে যেতেন। তাঁর সম্বন্ধে জানতে হলে আমার স্ত্রীর লেখা একখানা বই আছে, পড়ে দেখো। কি বলছিলাম? হাঁ মনে পড়েছে, আমি এ যুগে পরী দেখেছি কিনা?

দেখেছি বই কি! এই ত শেষ পরী দেখেছিলাম সেবার ওয়াণ্ডস্‌ওয়ার্থে। তার ছিল একখানা যাদু-করা জিনিসের দোকান। এখন পরীরা কখনও বড় দোকান সাজিয়ে বসেন না, লোকও রাখেন না। লোকেরা ত আর যাদু জিনিসের মর্ম বুঝবে না। তারা হয়ত যে জিনিস যার দরকার নয়, তাকে সেই জিনিস বিক্রী করবে। সাত মাইল-ছোটা জুতো জোড়া হয়ত একজন বাস-ড্রাইভারকেই গছিয়ে দিল। সে বেচারা রাত দিন বাস চালায়, তার ও-জুতো পরে কি লাভ হল বল ত? একজন পিয়ন ঐ জুতো জোড়া পেলে কত খুশি হত? আবার যথেষ্ট অনিষ্টও হতে পারে। তমসা-টুপির কথা তোমরা আগেই পড়েছ, ঐ টুপি একজন ট্রাফিক পুলিস যদি কিনে নিয়ে যায়, তার কি দশা হবে? সে ত আর বুঝতে পারবে না, সে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এদিকে বাস আর লরি এসে হুমড়ি খেয়ে পড়বে তার গায়ে। উপকারে ত লাগবেই না, মাঝখান থেকে বেঘোরেই বেচারার প্রাণটা যাবে। অথচ পোষাকের দোকানের কর্মচারী যদি ঐ টুপি কেনে ত তার কত স্থবিধে! পোষাক-পরানো পুতুল-গুলো টেনে নিয়ে আসবে, লোকে বলবে, “দেখেছ কেমন কল

একজন ভদ্রমহিলা বসে আছেন—পৃঃ ১৩১

ডিম ভাঙতেই দেখি শ্রীমান বোতামটি—পৃঃ ১৩৫

টিপে দিতেই পুতুলগুলো বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে!" কেউ কেউ দোকানে ঢুকে ভালো করে দেখবে পুতুলগুলো, কিন্তু কিছু না কিনে ত শুধু হাতে বেরিয়ে আসতে পারে না। আসবার সময় টুপি কি পাতলুন, কি কোট, কিছু না কিছু কিনে নিয়ে আসতেই হবে। দেখতে দেখতে দোকান ফেঁপে উঠবে, কর্মচারীটিরও বাড়বে মাইনে। তাই বলছিলাম, পরীরা কখনও বড় দোকান করে পাঁচ গণ্ডা লোক রাখতে চান না।

ওয়াগুস্‌ওয়ার্থে যে দোকানটায় আমি ঢুকেছিলাম, সেটা খুবই ছোট। দোকানে ঢুকে দেখলাম, একজন ভদ্রমহিলা বসে আছেন। তাঁর চুলগুলো প্রায় সাদা হয়ে গেছে, কিন্তু মুখখানা একেবারে কচি। আমি তাঁকে বললাম, "দেখুন আমার কলারের বোতাম হারিয়ে গেছে। আমাকে একটা বোতাম দিন ত?"

ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, "শুধু কি বোতামই হারিয়েছেন, না আর কিছু।"

"হাঁ, আর মেজাজটাও হারিয়ে ফেলেছি।"

মহিলা বললেন, "আপনার মেজাজ দেখছি বড় সস্তা জিনিস। বেশি দামের হলে নিশ্চয়ই সাবধানে রাখতেন। আচ্ছা, মেজাজ হারালে আপনি কি করেন বলুন ত? কাগজে নিশ্চয়ই বিজ্ঞাপন দেন, হারাইয়াছে, হারাইয়াছে! অমুক রাস্তায় আসিবার সময় ২৮শে তারিখে শুক্রবার আমার মেজাজ

হারাইয়া ফেলিয়াছি। যিনি পাইয়াছেন, খবর দিলে পুরস্কার দিব।”

“না, আমি বিজ্ঞাপন কখনও দিই নি। আর এ ত যে সে মেজাজ নয় যে বিজ্ঞাপন দিলেই পাওয়া যাবে! আটশ’ বছর আগের এক বুড়ী পরীর মেজাজ! অবিশ্যি তেজ এখন অনেক কমে গেছে, তবু বনেদী মেজাজ কিনা, এখনও যা আছে, তাই যথেষ্ট!”

“কোথায় কিনেছিলেন বলুন ত। যাদুঘরের কোনো তাক থেকে চুরি করেন নি ত?”

“চুরি করব কেন? সেই বুড়ী ছিলেন আমার ঠাকুমা, তাঁর নাম মেলুসাইন।”

“তুমি মেলুসাইনের নাতি! তাঁর সঙ্গে যে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। তোমার মেজাজ অত সস্তায় হারালে ত চলবে না। তাহলে শোন, এক উপায় আছে মেজাজটাকে একটা থলের মধ্যে পুরে বেঁধে দিচ্ছি!”

বললাম, “ধন্যবাদ, কিন্তু এখন তার দরকার হবে না। আপনি বরং একটা বোতাম দিন, একটা বাজে বোতাম গলায় এঁটে ফাঁসি পরবার জোগার, আগে গলা বাঁচুক তারপর মেজাজের বন্দোবস্ত করব।”

মহিলা এবার আমার কাছে একটা শূন্য ট্রে এনে বললেন, “এই যে অদৃশ্য বোতাম এনেছি। দেখ, কোনটা তোমার পছন্দ!”

"না, ন্না, অদৃশ্য জিনিস আমি নেব না। অদৃশ্য পোষাক পরলে একটা নিতে পারতুম।"

"তাহলে চিরসঙ্গী একটা বোতাম নিয়ে যাও। জীবনে আর কখনো হারাবে না। দাম হচ্ছে চার পেন্স তিন ফার্দিঙ।"

ভাগ্যগুণে আমার মানিব্যাগে তখন চার পেন্স আর তিন ফার্দিঙ ছিল, নইলে আর জিনিসটা কেনা হত না। পরীরা জিনিসের যা দাম ঠিক ঠিক সেইটি না পেলে জিনিস বিক্রি করেন না। আমি যদি এক শিলিঙ্ ফেলে দিয়ে বলতুম, দাম নিন। হয়ত, এক নিমিষে দোকানই শূন্যে মিলিয়ে যেত, আর পথের লোক হয়ত অবাক হয়ে দেখত, আমি গ্ল্যাডষ্টোনের মূর্ত্তির সঙ্গে বিড় বিড় করে কথা কইছি। তার ওপরে পরী রেগে গেলে আর ত রক্ষেই ছিল না। হয়ত রেলওয়ে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম টিকিটের একটা অটোমেটিক মেসিনই হয়ে যেতাম। যারা পকেটে খুচরো পয়সা রাখে না, তাদের ত অমনি একটা মেসিন হওয়াই উচিত! খুচরোর উপকারীতা তখনই তারা বুঝতে পারবে।

তাই বলছি, খুচরো না থাকলে পরীর দোকানে কখনো ঢুকতে নেই। আমি জানি, তোমরা খুচরো জমাতে ভালো-বাস। তোমাদের টাকা রাখবার থলে খুচরো পয়সায় ভরতি। তোমাদের কোনো ভয় নেই। বড় হলে লোকেরা নোট ছাড়া আর কিছুই রাখে না, আচ্ছা, কেন রাখে না বলতে

পার? কত মজার জিনিস ছোট বেলায় ওরা কিনেছে, সে-কথা ভুলে যায় কেন? কি জানি, আমি ভেবেও কিছু কুল-কিনারা করতে পারি নি। তবে আমি যখনই পথ চলি, আমার থলে ভর্ত্তি থাকে খুচরো পয়সায়। আর মজার জিনিসও অনেক কিনেছি, একদিন আমার বাড়ীতে এলে দেখাতেও পারি। এসো না!

বোতাম কেনা হয়ে গেল। সে বোতাম আজও আমার কাছে আছে, আর আমার সঙ্গে ওকেও কবর দেয়া হবে, তা আমি জানি। কেউ যদি ভুল করে কফিনের ভেতরে বোতামটাকে না পুরে দেয়, তাহলেও সে আমার কফিনের পেছনে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসবে, তখন কাঁদতে কাঁদতে যারা যাবে আমার সঙ্গে, তারাই হয়ত হো হো করে হেসে উঠবে। বোতামটাকে হারাবার কি কম চেষ্টা করেছি আমি! একবার বৃষ্টির সময় ড্রেনের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলাম। ভাবলাম, বৃষ্টির জলে নিশ্চয়ই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু কল টিপতেই দেখি, টুপ করে বেরিয়ে পড়ল বোতাম। তারপরে আর একটা ভাল মুক্তোর বোতাম কিনে এনে রেখেছিলাম, তার সঙ্গে কি কুস্তি! মুক্তোর বোতামটা পারবে কেন? ওর চাপে গুঁড়িয়ে ধূলো হয়ে গেল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় একটা উট পাখী বোতামটা গিলে ফেলেছিল। আমিই খাবারের মধ্যে পুরে ওকে দিয়েছিলাম খেতে, তারপর দিন ব্রেক-ফাষ্ট খেতে বসে ডিমের খোলা

স্টীম-রোলারের চাকা ফেটে চৌচির—পৃঃ ১৩৬

উড়ন্ত ফিতে-জোড়ার পেছু পেছু সবাই ছুটছে—পৃঃ ১৪০
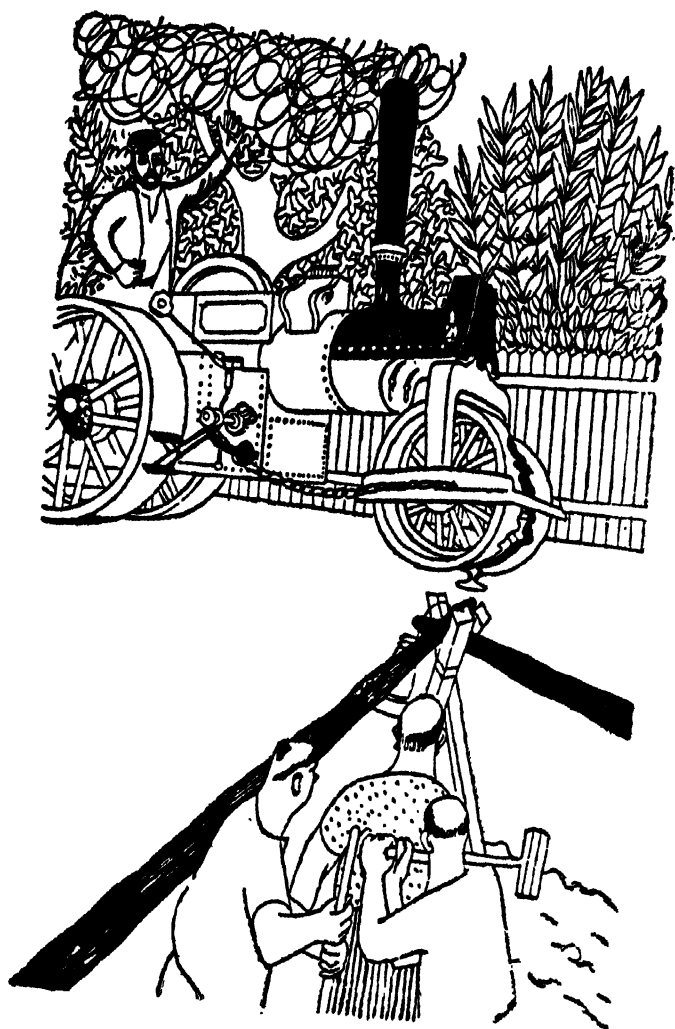
ভাঙতেই দেখি, তারই মধ্যে আমার শ্রীমান বোতামটি রয়েছেন। আর একবার জাহাজে করে আটলান্টিকের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন পোর্টহোল দিয়ে বোতামটা পড়ে যায়। ভাবলাম, যাক বোতামের হাত থেকে রক্ষে পাওয়া গেল! আটলান্টিক থেকে শ্রীমানের আর উঠে আসতে হবে না!

তোমরা ভাবছ, পরদিন ডিনারে মাছের রোষ্টের পেটে বুঝি বোতামটা বেরুল, মোটেই তা নয়। তার চেয়েও তাড়াতাড়ি বোতাম আমার কাছে ফিরে এল। প্রতি জাহাজের পেছনেই একটা জালের মত থাকে তাতে মাছের মত টিনের কতকগুলি চাকতি আটকানো থাকে। একে বলা হয় লগ, জাহাজ ছোটবার সময় এই জালখানা বার বার ঘুরপাক খায়। এই জালের সঙ্গে একটা মোটা দড়ি জাহাজের ঘড়ির মত একটা জিনিসের সঙ্গে বাঁধা থাকে। জাল ঘুরপাক খেলেই দড়িতে টান পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ঘড়িও চলতে থাকে। কাপ্তেন আর নাবিকেরা এই ঘড়ি দেখেই বুঝতে পারে, এক ঘণ্টায় জাহাজ কতদূর এল। এখন ব্যাপারটা হল কি জানো? ক্যাপ্টেন তাকিয়ে দেখেন দড়িও নড়ছে না, ঘড়িও চলছে না, কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়ই। তাঁরা জালটা টেনে তুলে ফেললেন, তুলে দেখলেন, মস্ত বড় একটা সমুদ্রের মাছ তার ন'টা শুঁড় দিয়ে দড়িটা আঁকড়েধরে আছে, আর তার দশ নম্বরের শুঁড়ে রয়েছে আমার যাদু-বোতাম।

জাহাজে অনেক যাত্রী, বোতামের উপরেও কোনো নাম লেখা নেই, কার বোতাম কে জানে! আমি আমার কেবিনে বসে বই পড়ছিলাম, একটি নাবিক এসে জানিয়ে গেল, একটা মস্ত সমুদ্রের মাছ ধরা পড়েছে, ক্যাপ্টেন আপনাকে ডেকেছেন।

এই জাহাজে একজন প্রাণীতত্ত্ব বিশারদ পণ্ডিত যাচ্ছিলেন, ক্যাপ্টেন আমাকে গোড়া থেকেই সেই লোক ভেবেছিল। আমিও ভুল শুধরে দেয়ার চেষ্টা করি নি। মাছ যখন ধরা পড়েছে, ছুটে যেতেই হবে উপায় কি! হয়ত বানিয়ে একটা বিদ্‌ঘুটে ল্যাটীন নামও বলতে হবে। গিয়ে হাজির হলাম। ব্যস আর যায় কোথা, আমার বোতাম আমার গলায় এসে লাফিয়ে উঠল।

আর একবার মোটরে যেতে যেতে দেখলাম, একটা স্টীম রোলার রাস্তা সমান করছে। ভাবলাম, ওই রোলারের নীচে বোতামটা ফেলে দিয়ে দেখাই যাক না কি হয়! যে কথা সেই কাজ। রোলারের সামনের চাকাটা এবার বোতামের উপর উঠে এল, তার পরেই এক ভীষণ শব্দ। শব্দে ত চোখ বুঁজেছিলাম, এবার খুলে দেখি, চাকা ফেটে চৌচির, শ্রীমানের কিছুই হয় নি। ড্রাইভার ত মহা খাপ্পা হয়ে এগিয়ে এল। আমি চাকার দাম দেব শুনে তবে ঠাণ্ডা! এদিকে স্টীম রোলার কোম্পানীর মালিক এসে বললেন, "মশাই আপনাকে দাম দিতে ত হবেই না, বরং আপনি যদি এ কথা কাউকে না

বলেন ত আমি আপনাকে কিছু দিতে রাজি আছি। আর আর যারা স্টীম-রোলার ব্যবসায়ী আছে, তারা শুনতে পেলে বলবে স্মিথের স্টীম-রোলার কিনো না।" একটা বোতাম, যে রোলার ভাঙতে পারে না, তা দিয়ে কি কাজ হবে বল ত ?

আমি ভদ্রলোককে বললাম, তাঁর কোনো ভয় নেই। আমার কাছ থেকে এ কথা আর এক কানও হবে না।

একবার একজন পাদ্রিকে বোতামটা উপহার দিলাম। তোমরা জানো বোধহয়, পাদ্রিরা কলার উলটে পরে, সঙ্গে সঙ্গে সামনের বোতাম যায় পেছনে, পেছনের বোতাম সামনে। এখন একদিন তিনি গির্জেয় বাইবেলের সেই জায়গাটা পড়ে শোনাচ্ছেন, যেখানে যিশু তাঁর শিষ্যদের বলছেন যে, জগতে যারা সব চেয়ে নীচ আর অধম হয়ে রইল পেছনে, তারাই স্বর্গরাজ্যে সামনে এসে দাঁড়াবে। যেই বলা, অমনি কলার ঘুরে গিয়ে আমার যাদু-বোতাম সামনে এসে হাজির। পাদ্রি ঘাবড়ে গিয়ে ভাবলেন, এমন চালাক চতুর বোতাম দিয়ে তাঁর কাজ নেই। তিনি আমাকে বোতামটি ফেরত দিলেন।

তাই ত! কোথেকে কোথায় এসে পড়েছি দেখ, এ সব ঘটনা ত আসবে অনেক পরে। এখন ত সেই পরীর দোকানের বোতাম কেনার গল্প বলছিলাম। তা আমি কি করবো, আমি ত ওস্তাদ গল্প বলিয়ে নই যে, বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে লিখব? যেমন মনে আসছে, আমি তেমনি করে তোমাদের বলছি।

আমি এবার সেই দোকানদার পরীকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার নামটা জানতে পারলে বড় খুশি হতাম।"

তিনি বললেন, "আমাকে তুমি মিস ওয়াণ্ডেল বলতে পার। পরীদের অবশ্য নামকরণ হয় খুব দেরীতে। এই ত আমারই বহু হাজার বছর পরে নামকরণ হয়েছে। আমি আগে ছিলাম নদীতে, তারপর নদীগুলো সব জাহাজে ভরে যাওয়ায় ডাঙায় এসে আছি। তবে আবার নদীতেই ফিরব। এই লণ্ডন শহরের উপর দিয়ে দু-তিন হাজার বছরের ভেতরেই আবার এক প্রকাণ্ড নদী বয়ে যাবে।"

আমি বললাম, আপনার দোকানটা ছিল বলে বোতাম কেনা হল। আজকাল ত এ-সব পাওয়াই যায় না। কতদিন আপনি দোকানদারী করছেন?"

"কতদিন!" তিনি হেসে উঠলেন, "তা আমারও ঠিক মনে নেই। যখন আমি নদীতে থাকতাম, তখন থেকেই জিনিস কেনা-বেচা শুরু করেছি। আটশ' বছর আগে লোকেরা আমাকে বলত পরী। তার আগে রোমের লোকেরা আমার নাম দিয়েছিল নায়াদ; তারও আগে যারা ইংলণ্ডে বাস করত, তারা ব্রোঞ্জের কাজ করত, তারা আমাকে তয়াসি বলে ডাকত। এখন যেখানে উইমব্লেডনের টেনিস খেলার মাঠ, সেখানে থাকত এক মোটা সোটা ড্রাগন। কত বড় বড় যোদ্ধা তাকে মারতে চেষ্টা করল, কিন্তু তাকে হত্যা করা কি সহজ! তার নিশ্বাসে আগুন বেরিয়ে সবাইকে পুড়িয়ে দিল। একজন

যোদ্ধাও হুমড়ি খেয়ে পড়ল এসে ঠিক আমারই নদীর ধারে। তাকিয়ে দেখি, ড্রাগনের নিশ্বাসে তার সারা দেহ ঝলসে গেছে। তাকে জল ঢেলে ঠাণ্ডা করে বললাম, 'বাপু; ড্রাগন মারতে হলে ওসব লোহার বল্লম আর বর্মে কোনো কাজ হবে না।' তারপর একটা উপায়ও বাতলে দিলাম। পরের দিন যোদ্ধাটি অ্যাসবেস্টসের বর্ম পরে দু'হাতে দু'টো আগুন নেবাবার যন্ত্র নিয়ে গিয়ে হাজির হলো। এবার কিন্তু ড্রাগন মরল, দেশের লোকও খুব খুশি হল। যোদ্ধাটি আমার নদীর দু-পারে নানা লতা-পাতার ঝাড় করিয়ে দিলেন। তখন কি দিনই ছিল! সেই পৃথিবী আজ খুঁজলেও মিলবে না। তাই আমার চুলও পেকে যাচ্ছে। কিন্তু আমার আশা আছে, এই পাকা চুল আবার কালো হবে, আবার আসবে সে সুদিন। তোমরা কি কাণ্ডই না করছ? নদীকে শুষে পাইপে ভরছ, এর শোধ তুলবেই একদিন নদী। সেদিন লণ্ডনের বুকের উপর জল থই থই করবে। থাকগে ওসব কথা, তোমার আরো কিছু চাই নাকি? জুতোর যাদু-করা ফিতে, দেব নাকি?"

যাদু-করা জুতোর ফিতের কথা শুনে আঁতকে উঠলাম, মনে পড়ল আমার বন্ধু ম্যাকফারলেনের কথা। ও কোত্থেকে জুতোর ফিতে কিনে এনেছিল। খুব মজবুত, কখখনো খুলে যায় না। শুধু মন্ত্র পড়েই খোলা যায়। একদিন ম্যাক ফিতে খোলার মন্ত্র ভুলে গেল।

জুতো নিয়েই সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। তারপর তিন-

তিনটি মাস সারা দিনরাত সেই জুতো পরেই সে কাটিয়েছে। কি অস্বস্তি বল ত? তারপর একদিন এক যাদুকর এসে ফিতে খোলার মন্ত্র পড়ে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ম্যাক পেল মুক্তি। এবার সে নোটবুকের পাতায় মন্ত্রটা টুকে রাখল। কিন্তু বিপদ হল আর এক দিকে। জুতো জোড়ার তলাটা খয়ে গিছলো, তাই ম্যাকের স্ত্রী একদিন এক মুচির দোকানে সেটা সারাতে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু ফিতে জোড়া কাঁচা চামড়ার গন্ধ সহ্য করে মুচির ওখানে কাটাতে রাজি হল না। তারা জুতোর থেকে সাপের মত মুড়ে দুমড়ে কোনোরকমে বেরিয়ে এল, তারপর উড়ে চললো ম্যাকের বাড়ীর দিকে। রাস্তার লোকগুলো ওদের ধরবার জন্য পেছনে তাড়া করল, কিন্তু যাদু-ফিতে ধরা কি অত সহজ নাকি! ফিতেও পালিয়ে গেল বাড়ীর ভেতরে, এদিকে হাজার হাজার লোকের পায়ের চাপে বাগানের একটা ফুল গাছও আস্ত রইল না। হায়, কত সাধ করে ম্যাক বাগান করেছিল! এদিকে রাঁধুনি আর চাকর এসে বলল, তাদের পাওনা মিটিয়ে দেয়া হোক। যে বাড়ীতে সাপ উড়ে বেড়ায়,সেখানে তারা কাজ করতে পারবে না। যাদু-ফিতে কিনে বেচারার কি বিপদ বল ত? আমি তাই সাধারণ ফিতে দিয়েই কাজ চালাব,যাদু-ফিতের আমার দরকার নেই বাবা!

আমি মিস ওয়াণ্ডেলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, "আমার ফিতের দরকার নেই।" তারপর...

আমার গল্পও এবার ফুরোলো।